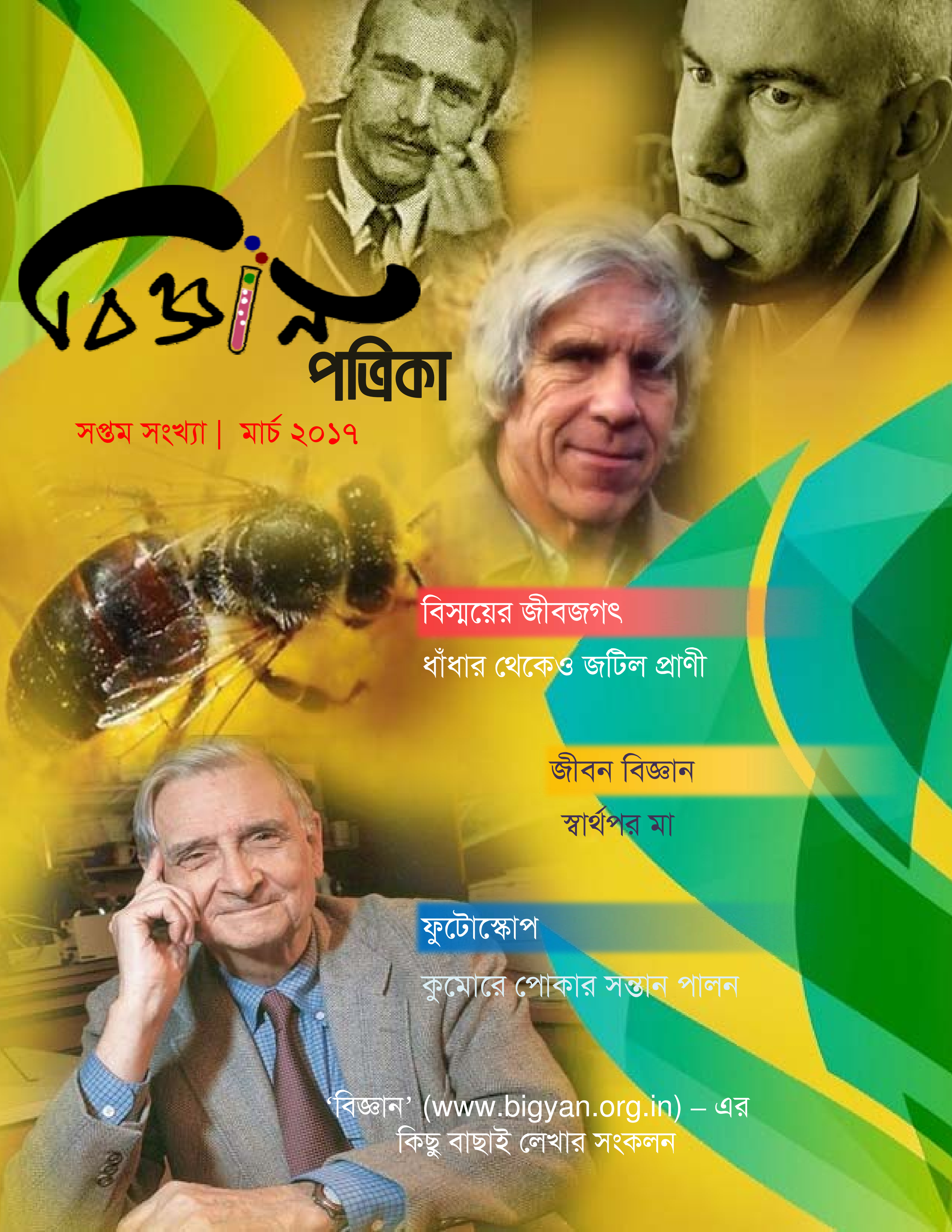

বিজ্ঞান পত্রিকা

সপ্তম সংখ্যা | মার্চ ২০১৭

বিস্ময়ের জীবজগৎ

ধাঁধার থেকেও জটিল প্রাণী

জীবন বিজ্ঞান

স্বার্থপর মা

ফুটোস্কোপ

কুমোরে পোকার সন্তান পালন

'বিজ্ঞান' (www.bigyan.org.in) – এর
কিছু বাছাই লেখার সংকলন

বিজ্ঞান পত্রিকা

সপ্তম সংখ্যা | মার্চ ২০১৭

www.bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

প্রচ্ছদের ছবি প্রসঙ্গে

এই সংখ্যার প্রচ্ছদের ছবি রূপায়িত হয়েছে প্রকৃতিবিজ্ঞানের চার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব জে.বি.এস. হ্যালডেন, ডব্লু.ডি. হ্যামিলটন, ই.ও. উইলসন ও মার্টিন নোয়াক – কে স্মরণ করে।

ছবির উৎস:

https://en.wikipedia.org/wiki/J._B._S._Haldane
https://en.wikipedia.org/wiki/W._D._Hamilton
http://www.stephenjaygould.org/people/william_hamilton.html
https://en.wikipedia.org/wiki/E._O._Wilson
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Nowak

স্কুলে ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ‘বিজ্ঞান’ পত্রিকার ছয়টি সংখ্যা। স্কুলের মাধ্যমে মফঃস্বল ও গ্রামের বিভিন্ন স্কুলে – যেমন এগরা, হলদিয়া, পাহাড়হাটি, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, সাগরদ্বীপের মত জায়গায় – ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছচ্ছে ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’র লেখা। নিচে রইল তারই কিছু উল্লেখ।

খানসাহেব আবাদ হাই স্কুল,
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

বৈদ্যপুর রাজ রাজেশ্বর
বালিকা বিদ্যালয়,
বর্ধমান

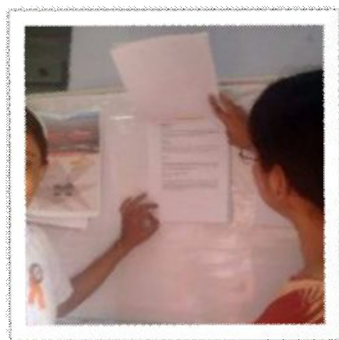

নীলকান্ত পাল হাই স্কুল,
জলপাইগুড়ি

পাহাড়হাটি হাই স্কুল, বর্ধমান

সূচীপত্র

ধাঁধার থেকেও জটিল প্রাণী

অঞ্জন নন্দী ০৮

আপনি কার কার জন্যে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতে পারেন? ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, দূরসম্পর্কের ভাইবোন, তাদের ছেলেপুলে, ... ? বিজ্ঞান কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? পারে কি সেইসব মৌমাছিদের চরিত্রকে বোঝাতে, যারা রাণীর সেবায় গোটা জীবনটা উৎসর্গ করে দেয়? ডারউইন তো বংশবৃদ্ধি বলেই খালাস, কিন্তু যারা নিজেরা জন্মই দেয়না, তাদের আবার বংশবৃদ্ধি কি? এইসব ধাঁধার উত্তর নিয়ে এসেছেন আই.আই.এস.ই.আর, কলকাতার সিনিয়ার রিসার্চ সায়েন্টিস্ট, অঞ্জন নন্দী।

স্বার্থপর মা

অনিন্দিতা ভদ্র ২৩

সন্তান তার পিতামাতার কাছে প্রাণাধিক প্রিয়। তবু প্রকৃতির নিয়মই কখনও কখনও বাধ্য করে পিতামাতাকে সন্তানের প্রতিযোগী হয়ে উঠতে। বিবর্তনের দৃষ্টিতে পিতামাতা ও সন্তানের এই সংঘাত অবাঞ্ছিত তো নয়-ই বরং অত্যন্ত জরুরী। একদল কুকুর ও তাদের সদ্যজাত সন্তানসন্ততির ওপর হাতেকলমে পরীক্ষার মাধ্যমে এর উত্তর খোঁজার চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা। বিবর্তনবাদ ও রাশিবিজ্ঞানের মেলবন্ধনে এই চমকপ্রদ তত্ত্বের ব্যখ্যা ও পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের কথা বিজ্ঞানের পাঠকদের বলছেন সেই বিজ্ঞানীদলের প্রধান অনিন্দিতা ভদ্র।

মায়েরা যেমন হয় – কুমোরে পোকার সন্তান পালন

অনিন্দিতা ভদ্র ২৯

বাড়ির জানলা , দরজা , ইলেকট্রিক বাক্সে বা পরিত্যক্ত জিনিসে অনেকেই দেখেছি মাটি দিয়ে তৈরী হাঁড়ির মতো কুমোরে পোকার বাসা। ঠিক কেন মা-কুমোরে পোকারা এই বাসা বানায় ? কুমোরে পোকার বাসার ভেতরের খবর নিয়ে লিখেছেন অনিন্দিতা ভদ্র ।

পেঁয়াজি

পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী ৩১

পেঁয়াজ বড়ই পাজি । রান্না করতে পেঁয়াজ কেটেছ কি মরেছ । চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল নেমে আসবে । এমন কেন হয়, তার রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ে লিখেছেন পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী ।

সম্পাদকীয়

ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় প্রচন্ড উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনেকেই বাংলায় ভালো বিজ্ঞানের লেখার অত্যন্ত অভাব বোধ করতাম। স্কুলের বেশিরভাগ পাঠ্যবইতে যেরকম নীরসভাবে বিজ্ঞান পড়ানো হয়, তাতে বিজ্ঞানের উৎসাহ পালাতে পথ পায় না। জিজ্ঞাসার জায়গায় চলে আসে নম্বর নিয়ে প্রতিযোগিতা। নম্বর দিয়ে বিচার হয় একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মেধা, চাপা পড়ে যায় জিজ্ঞাসু মনটা। অথচ পরবর্তী জীবনে আমরা যখন গবেষণা করতে আসি তখন দেখি সেখানে নম্বরের কোনো মূল্যই নেই। যে সৃষ্টিশীল, যে নতুন নতুন ভাবনার জন্ম দেয়, যার মনে পাখা মেলে কল্পনারা, আর সেই কল্পনাকে বাস্তব করতে যে পুরোনো ভাবনার ভুল-ত্রুটি দূর করে নতুন পথের দিশা দেখায়, বিজ্ঞানের দরবারে তারই কদর।

সৃষ্টিশীলতা মানুষের সহজাত। তাই নতুন প্রজন্মকে নম্বর বাড়ানোর ইঁদুর দৌড়ে সামিল না করে মুক্তমনে ভাবনা চিন্তা করার অবকাশ দিতে হবে আমাদের। সেই আশাতেই বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন আবিষ্কারের গল্প আমরা ‘বিজ্ঞান’-এর ওয়েবসাইটে তুলে ধরি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। ‘বিজ্ঞান’-এ প্রকাশিত লেখার বাছাই সংকলন হল ত্রৈমাসিক ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’।

এবারের সংখ্যায় আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি মূলত প্রাণীজগতে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব। কোনো জটিল যন্ত্র বা কঠিন তত্ত্ব ছাড়াই বিজ্ঞানীরা কেবল অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এই দ্বন্দ্বের খুঁটিনাটি খুঁজে বার করেছেন। কেবল অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আর চোখ-কান খোলা রেখেই তাঁরা করে গেছেন একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, দেখিয়েছেন আমাদের আসে-পাশের আপাত সাধারণ ঘটনার মধ্যে বিজ্ঞানের অসাধারণ কারসাজি। আমাদের বিশ্বাস এই লেখাগুলি আমাদের পাঠক বন্ধুদের বইয়ের বাইরের জগৎকে বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে দেখতে অনুপ্রাণিত করবে। জন্ম নেবে বিজ্ঞানের প্রতি অপরিসীম আগ্রহ/ভালোলাগা।

প্রথম লেখাটির ভূমিকায় একটা আপাত সহজ প্রশ্ন করা যায়। আচ্ছা বলো তো, পুকুরে হাবুডুবু খাওয়া ভাইকে বাঁচাতে কি তুমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে? প্রথমে শুনে মনে হতে পারে, ‘অবশ্যই, ভাই ডুবে যাচ্ছে, বাঁচাবো না?’ কিন্তু একটু ভাবলেই পরিষ্কার হবে যে, উত্তরটা নির্ভর করবে জলে লাফ দিতে কতটা ‘রিস্ক’ আছে, তার উপর। যদি কেউ জানে যে জলের স্রোত এমন যে ঝাঁপ দিলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু, তাহলেও কি সে ঝাঁপ দেবে? আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, মনুষ্য সমাজে অনেকেই আছে যারা নিজেদের বিপদের তোয়াক্কা না করেই এগিয়ে যায় অন্যদের সাহায্য করতে, আবার অনেকেই আছে যারা তুলনামূলকভাবে বেশি ‘স্বার্থপর’।

এই ‘স্বার্থপরতা’ বা ‘স্বার্থশূন্যতা’ কি একান্তই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য? না কি এটাও বিবর্তনের নিয়মে কোন প্রজাতির মধ্যে বেশি আর কোন প্রজাতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম আছে? এই প্রশ্নটার উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়ে চলেছে অনেকবছর ধরে। সন্তানের কল্যানের জন্য পিতামাতার স্বার্থত্যাগ বহু প্রজাতির মধ্যেই দেখা যায়। এটা বোঝা যেতে পারে এইভাবে, যে সন্তানকে বাঁচানোর মাধ্যমে কোন প্রজাতি আসলে নিজের ভবিষ্যতই রক্ষা করছে। কিন্তু এই তত্ত্বে যে গলদ আছে তা দেখিয়ে দিল এক অতি পরিচিত প্রাণী - শ্রমিক মৌমাছি! এদের সন্তান হয় না, অথচ এদের নিঃস্বার্থ ব্যবহারের জুড়ি নেই। কেন? এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুশকিলে পড়লেন অনেকেই, এমনকি বিবর্তনবাদ তত্ত্বের প্রবর্তক ডারউইনও। ডারউইন তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় আশি বছর পরে কিভাবে হল এই গোলমেলে ধাঁধার সমাধান, সেই গল্প পড়া যাবে ‘ধাঁধার থেকেও জটিল প্রাণী’ লেখাটিতে।

এই ধাঁধার সমাধান তো হল, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা নানা কঠিন পরীক্ষা করে যাচাই করলেন এই তত্ত্বের যথার্থতা। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা গেলো অনেক ক্ষেত্রেই এই তত্ত্ব খাটে। এমনকি আমাদের অতি পরিচিত প্রাণী কুকুর, বেড়ালও এই তত্ত্বের আওতায় পড়ে, তাই তাদের উপর পরীক্ষা করেই এই তত্ত্ব প্রমাণ করা যায়। বাঁচার তাগিদে কোন মা কি করে তাঁর সন্তানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে সেই আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা আমাদের শোনাচ্ছেন অনিন্দিতা ভদ্র, 'স্বার্থপর মা'লেখাটিতে। এটি লেখিকা ও তাঁর সহকর্মীদের মৌলিক গবেষণা।

কিন্তু আমরা তো সকলেই জানি সন্তানদের প্রতি মায়েদের ভালোবাসা এক অনন্য অনুভূতি। শুধু মনুষ্যসমাজে নয়, প্রায় সমস্ত প্রাণীজগতেই এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। অনিন্দিতা ভদ্র বলছেন কুমোরে পোকাদের মায়েদের আখ্যান, যাদের বাঁচার একমাত্র উদ্দেশ্য হল সন্তানের জন্ম দেওয়া ও তাকে বড় করার ব্যবস্থা করা। কিন্তু কুমোরে পোকারা কেন এমন করে? ডারউইনের বিবর্তনবাদ থেকে কি এর উত্তর পাওয়া যায়? মায়েদের চিরপরিচিত সন্তান স্নেহের উপাখ্যান জানতে হলে পড়তে হবে এই লেখাটি।

বিবর্তনের উপর লেখাগুলো ছাড়াও এই সংখ্যায় রয়েছে 'দৈনন্দিন জীবনে রসায়ন' বিভাগের একটি লেখা। খুব সহজ একটা প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে 'পেঁয়াজি' লেখাটি - পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে চোখে জল তো আমাদের সকলেরই আসে, কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারলে এমন প্রশ্নও তো করা যায়, এমন পেঁয়াজ কি কোনভাবে 'তৈরি করা' যায় যা কাটলে চোখ দিয়ে জল গড়ায় না?

আশা করি বিজ্ঞান পত্রিকার এই নতুন সংখ্যাটি পড়তে সকলের ভালো লাগবে। মন্তব্য পাঠাতে আমাদের ইমেইল করবে bigyan.org.in@gmail.com - এই ঠিকানায়।

সম্পাদকমণ্ডলী, 'বিজ্ঞান'
মার্চ ২০১৭

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম (ইনস্টিটিউট ফর কোয়ান্টাম কম্প্যুটিং, ওয়াটার্লু বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, সিনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ‘বিজ্ঞান’-এর কো-অর্ডিনেটর)
- অর্ণব রুদ্র, জুনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- আবির দাস (ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, লোয়েল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুমন্ত্র সরকার (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সূর্যকান্ত শাসমল(কগনিজেন্ট টেকনোলজি সলিউশনস, কলকাতা, ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র প্রযুক্তি সম্পাদক)
- নীলাব্জ চ্যাটার্জী (ইউনিভার্সিটি অফ অসলো, নরওয়ে, ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র প্রযুক্তি সম্পাদক)
- চিরঞ্জীব মুখার্জী (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- দীপ্যমান প্রামাণিক (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- ঝুমা সন্নিগ্রাহী (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট, ড্রেসডেন, জার্মানী)
- অমলেশ রায় (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কোল রিসার্চ, জার্মানী)
- কৌশিক ব্যানার্জী (ইনটেল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুদীপ্ত ব্যানার্জী (NGO পদক্ষেপ ও এমপ্লয়ী বেনিফিট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শিলাদিত্য দেওয়াসি (NGO পদক্ষেপ ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ)
- শ্রীনন্দা ঘোষ (NGO পদক্ষেপ ও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ড্রেসডেন, জার্মানী, ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র কো-অর্ডিনেটর)
- অমিয় মাজি (পারডিউ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- ধ্রুবজ্যোতি সিনহা (আই. এম. আর. বি. ইন্টারন্যাশনাল, ক্যান্টার গ্রুপ)
- এবং সহযোগিতা করছেন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বাঙালী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রেমী।

‘বিজ্ঞান পত্রিকা‘-র সম্পাদনা – শ্রীনন্দা, সূর্যকান্ত, নীলাব্জ, কুণাল, অর্ণব, অনির্বাণ, ধ্রুবজ্যোতি, ও রাজীবুল

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

ইপাব পত্রিকা : নীলাব্জ

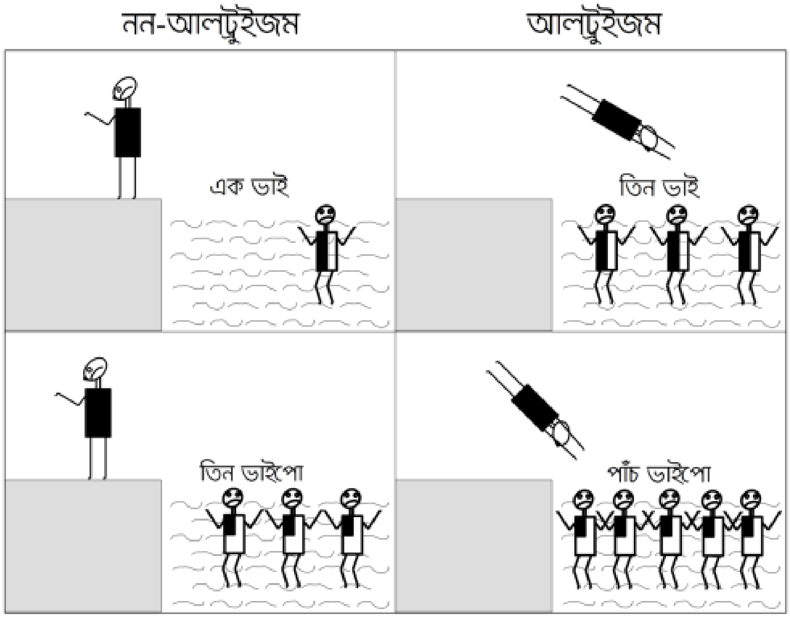

ধাঁধার থেকেও জটিল প্রাণী

অঞ্জন নন্দী

|| ডারউইনের সমস্যা ||

ধরুন আপনি যাচ্ছেন পাড়ার পুকুরের পাশ দিয়ে। হঠাৎই খেয়াল করলেন আপনার ভাই জলে ডুবে যাচ্ছে। কি করবেন তখন? সাঁতার জানলে নিশ্চই কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বেন জলে! কিন্তু বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আরেকটা সম্ভাবনার কথা বলতে পারেন। ঠিক যেমনটা বলেছিলেন জে.বি.এস. হ্যালডেন[১]: "যদি আমার একজন বা দু'জন ভাইকে জলে ডুবে যেতে দেখি, তাহলে হয়ত তাদের বাঁচাতে জলে লাফ মারব না। কিন্তু যদি তিনজন বা তার বেশি সংখ্যক ভাইয়ের জলে ডুবে যাবার মত পরিস্থিতি হয়, তাহলে আমি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জলে ঝাঁপ দিতে পারি।"

খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তাই না? হ্যালডেন কথাটা বলেছিলেন অবশ্যই একটা 'মেটাফর' বা রূপক হিসেবে। ঘটনাটা সত্যি সত্যি ঘটলে তিনি নিশ্চয়ই জলে লাফিয়ে পড়ার আগে এত হিসেব কষতেন না! আসলে হ্যালডেনের এই কথাটার মধ্যে লুকিয়ে ছিল একটা সংকেত - প্রকৃতিবিজ্ঞানের অনেক দিনের পুরনো একটা ধাঁধার উত্তর, যে ধাঁধার মীমাংসা স্বয়ং চার্লস ডারউইনও তাঁর জীবনকালে করে যেতে পারেননি। জানতে চান কি সেই ধাঁধা? বুঝতে চান কেন সেটা কঠিন? কি সংকেত দিয়েছিলেন হ্যালডেন? আর তা থেকে কি করেই বা বেরিয়ে এল সমাধান? তাহলে আসুন, এই গল্পে আপনাকে স্বাগত। নিজেই দেখে নিন কেমন করে

বিজ্ঞান হয়ে ওঠে গোয়েন্দা গল্পের মতই রোমাঞ্চকর।

একা, নাকি অনেকে মিলে?

প্রথমে একটা কথা ভেবে দেখুন: এই যে আপনি ভাইকে বাঁচাতে জলে লাফ দেবেন ভাবছেন, সেটা আসলে কেন? ভাই ডুবে গেলে আপনার কি আসে যায়? জলে লাফ দিয়ে পড়লে আপনার নিজেরও তো চরম ক্ষতির আশঙ্কা! আপনি বলবেন, এ আবার কি কথা? মানুষ কি সবসময় শুধু একা নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই কাজ করে নাকি? ব্যস! আপনি কিন্তু ঢুকে গেলেন এই ধাঁধায়! আসলে একটা প্রাণী কখন কতটা স্বার্থপরের মত আচরণ করবে, আর কখন হয়ে যাবে নিঃস্বার্থ, উদার এক পরোপকারী জীব, সেই নিয়েই এই ধাঁধাটা। আর এই ধাঁধায় শুধু আপনার আমার মত মানুষই নয়, জড়িয়ে আছে রোজকার চোখে পড়া হাজারো পশুপাখি, বলতে গেলে পুরো জীবজগতটাই। কিভাবে? চলুন এবারে একটু বিস্তারিত আলোচনায়।

আমরা শুরু করব সহজ কিছু উদাহরণ থেকে। ভারতের বর্তমান জাতীয় পশুর দিকেই তাকান। প্রজনন আর সন্তানধারণের আবশ্যিক সময়টুকু বাদ দিলে বাঘ মোটামুটি একা একাই জীবন কাটায়, শিকার ধরে। এমনকি ওই দরকারী সময়েও, বাঘ কখনই সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য শিকার করেনা, অন্তঃসত্ত্বা বাঘিনীকেও নিজের খাবার নিজেকেই যোগাড় করতে হয়। বাঘের ছানারাও শিকার ধরতে শিখলেই মাকে ছেড়ে চলে যায়, আর কখনই ফিরে আসেনা। বাঘের স্বভাবচরিত্র - যেমন ঘন জঙ্গলে থাকা, বা চুপিসাড়ে ওৎ পেতে শিকার ধরা - বাঘের এই একলা জীবনযাত্রার সঙ্গে দিব্যি মানানসই। বিজ্ঞানের ভাষায় বাঘ হল একান্তবাসী বা অযুক্তচর প্রাণী (সলিটারী এনিম্যাল)।

অন্যদিকে ভারতের প্রাক্তন জাতীয় পশু সিংহের[২] চালচলন দেখুন, বাঘের ঠিক উলটো। সিংহ থাকে দল বেঁধে। একটা বড়সড় দলে অনেকগুলো সিংহী আর তাদের ছানাপোনারা তো থাকেই। সঙ্গে থাকে অন্তত একটা পূর্ণবয়স্ক সিংহ, কখনো কখনো একের বেশিও। বিজ্ঞানীরা এদের বলেন সামাজিক প্রাণী বা সোশ্যাল এনিম্যাল। সিংহ পছন্দ করে একদম খোলা সাভানা[৩] জাতীয় মাঠ। শিকারটা হয় সমবায় প্রথায় - অনেকে মিলে একসাথে আলাদা আলাদা দিক থেকে শিকারকে আক্রমন করে।

কিন্তু খাবার ভাগাভাগির সময় হয় এক চিত্তির। পূর্ণবয়স্ক সিংহরা শিকারের সময় খুব একটা গা লাগায়না, কিন্তু খাবারের সবচেয়ে বড় ভাগটা সবার আগে তারাই নিয়ে নেয় গায়ের জোরে। এরপর পালা আসে সিংহীদের, যারা কিনা আসল শিকারী। বড়রা সবাই খেয়েদেয়ে নিলে তারপর যেটুকু বেঁচেবর্তে থাকে, ছানাপোনাদের তাই দিয়েই চালিয়ে নিতে হয়। আধপেটা খেতে খেতে অনেকসময় এদের মধ্যে কেউ কেউ মারাও পড়ে। কাজেই সিংহ-সমাজে সহযোগিতা (কোঅপারেশন) আর সংঘাত (কনফ্লিক্ট) একে অন্যের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। আর বিজ্ঞানীদের উৎসাহও ঠিক এইখানে। এইধরণের সামাজিক প্রাণীদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থের এত সংঘাত, তাও তারা কি করে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রাখে? আর কেনই বা রাখে? ঠিক এইখানেই লেগে যায় ধাঁধা!

কীটপতঙ্গের দুনিয়ায়

এই সলিটারী আর সোশ্যাল বিভাজনটা কিন্তু শুধু বাঘ, ভালুক, কিংবা সিংহ, হাতিতেই[৪] আটকে নেই! আপনার নিজের ঘরের মধ্যেই তাকিয়ে দেখুন - যার উৎপাতে আপনি প্রতি রাত্রে মশারি খাটান অথবা কয়েল জ্বালান, সেই আদি অবিনশ্বর মশা কিন্তু একটা সলিটারী প্রাণী। স্ত্রী মশা বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে যে লার্ভা বেরোয় তারা নিজেদের খাবার নিজেরাই যোগাড় করে নেয়। তাই শুধু প্রজননের সময়টুকু ছাড়া মশার জগতে একজনের সাথে আরেকজনের কোনো যোগাযোগই নেই। কিন্তু 'হানি বী' বা মৌমাছিদের বেলায় ব্যাপারটা পুরো অন্য রকম। তারা আবার সঙ্গীসাথী ছাড়া বাঁচতেই পারেনা। কোনো মৌমাছি যদি বাসায় ফেরার রাস্তা হারিয়ে ফেলে তাহলে সে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যাবেই!

প্রাণীজগতে সামাজিকতা বা সোশ্যালিটির একটা চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায় এই মৌমাছিদের মধ্যে। বড় বড় বিল্ডিং-এর কার্নিশে, গাছের ডালে বা পাথরের খাঁজে, মৌমাছিদের বিশাল আকৃতির বাসা ঝুলে থাকতে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। এই বাসাগুলো তৈরী হয় মোম দিয়ে, মধ্যে থাকে ছ'কোণা আকারের খুপরি খুপরি ঘর। এই ঘরগুলোর কিছুতে জমা থাকে খাবার: পরাগরেণু আর মধু। একদল মৌমাছি সারাদিন ঘুরে ঘুরে সেগুলো যোগাড় করে আনে। আর বাকি ঘরগুলোতে বড় হয় লার্ভারা, এই জমা করে রাখা ফুলের রেণু আর মধু খেয়ে খেয়ে। এইরকম একেকটা কলোনীতে মৌমাছির সংখ্যা কখনো কখনো দশহাজারও ছাড়িয়ে যায়।

এদের মধ্যে মাত্র একজনই থাকে 'কুইন বী' বা রাণী-মৌমাছি, বাকিদের থেকে সাইজে সে বেশ কিছুটা বড়। রাণী নড়াচড়া করতে খুব একটা পছন্দ করেনা, তার কাজ শুধু মেশিনের মত ডিম পেড়ে যাওয়া। বিশেষ মরশুমে কলোনীতে সামান্য সংখ্যায় পুরুষ-মৌমাছি জন্মায় (মেরেকেটে একশো), যাদের বলে 'ড্রোন'। কলোনীর জন্য খাটাখাটনিতে তাদেরও বিশেষ রুচি নেই। রাণী আর ড্রোন-রা ছাড়া বাকি যে হাজার হাজার মৌমাছি, তারা সবাই কিন্তু স্ত্রী – পরিভাষায় তাদের বলে 'ওয়ার্কার বী' বা শ্রমিক-মৌমাছি। এই ওয়ার্কারদের জীবনযাত্রা বড়ই অদ্ভুত, আর সেটাই হল আমাদের ধাঁধার সবচেয়ে বড় উৎস! তাই এবার আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে কোথায় এরা বাকিদের চেয়ে আলাদা।

মা ফলেষু কদাচন

শ্রমিক-মৌমাছির জীবন শুরু হয় ঐ বিশাল বাসার কোনো একটা ছ'কোণা খুপরি ঘরে। খালি ঘর পেলেই রাণী সেখানে এসে ডিম পেড়ে যায়। তিন দিন বাদে সেই ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে লার্ভা। অন্য শ্রমিকরা তখন এই লার্ভাদের আদরযত্ন করে, খেতে দেয়। লার্ভা একটু বড় হলে আবার এই শ্রমিকরাই মোম দিয়ে খুপরির মুখ বন্ধ করে দেয়, ভিতরের লার্ভা তখন বদলে যায় পিউপাতে। এই পিউপা অবস্থায় হপ্তা দুয়েক থাকার পর জন্ম নেয় পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক-মৌমাছি। খুপরির বন্ধ মুখ কেটে সে নিজেই বাইরে বেরিয়ে আসে।

প্রথমেই তার কাজ হল খুপরিটাকে সাফ-সুতরো করে ফেলা, যাতে করে রাণী আবার সেখানে এসে ডিম পেড়ে যেতে পারে। দিন দুয়েক পর থেকেই শুরু হয়ে যায় তার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পালা। প্রথম দিকে রাণী আর অন্য লার্ভাদের ক্রমাগত পরিচর্যা, পরের দিকে খাবার-দাবার সামলানো, নতুন খুপরি

তৈরী করা বা বাসা পাহারা দেওয়া। দিন কুড়ি পর থেকে শুরু হয় বাসার বাইরে আসা যাওয়া; 'বী-ঈটার' পাখি আর পোকাদের নজর এড়িয়ে খাবার খুঁজে বাসায় নিয়ে আসা। এই রুটিন চলতেই থাকে দিনের পর দিন। তারপর একসময় শরীর জবাব দেয়, তার ডানায় ভর করে আসে ক্লান্তি। তখন তার এতদিনের সাথীরাই তার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাসার বাইরে। প্রায় ছ' থেকে আট হপ্তার এই শ্রমিকজীবন এইভাবেই শেষ হয় সহকর্মীদের মৃতদেহের ঢিপিতে।

লক্ষ্য করে দেখুন, শ্রমিক-মৌমাছিদের এই জীবনচক্রে প্রজননের কোনো জায়গাই কিন্তু নেই! আর থাকবেই বা কি করে? এদের যে মিলনের ক্ষমতাটাই নেই! সন্তানের জন্ম দেওয়া তাই এদের কাছে সুদূর স্বপ্ন। স্ত্রী-মৌমাছিদের মধ্যে মিলনের ক্ষমতা আছে একমাত্র রাণীর, ডিম পাড়ার অধিকারীও একমাত্র সে। হ্যাঁ, একমাত্র একটা বিশেষ সময়েই শ্রমিকদের ডিম পাড়তে দেখা যায়৫, যখন কোনো কলোনীতে রাণী মারা যায়। তবে তেমন সুযোগ কমই জোটে, কারণ রাণীরা দু'তিন বছর অনায়াসে বেঁচে থাকে। তাই বলতে গেলে একটা শ্রমিক-মৌমাছি সারা জীবন ধরে শুধু সেই কলোনীর রাণীর ছানাপোনাদের পেছনেই গাধার খাটনি খেটে যায়। তাই শ্রমিক-মৌমাছিকে বলা যেতেই পারে নিঃস্বার্থ সেবা আর আত্মবলিদানের এক চরম প্রতীক। বিজ্ঞানের ভাষায় এই আচরণের নাম 'আলট্রুইজম'।

এতেই শেষ নয়। মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়লে কি হয় তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। পাহারাদার শ্রমিক-মৌমাছিরা যদি বোঝে যে তাদের বাসায় হামলা হয়েছে, তারা দলে দলে হামলাকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। মৌমাছির হুলের ডগায় তীরের ফলার মত একটা অংশ থাকে। শিকারের গায়ের চামড়া একটু মোটা হলেই হুলটা এমন শক্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে যায় যে আর সেটাকে টেনে বার করা যায়না। হুল ফোটানোর পর মৌমাছি যখন উড়ে পালানোর চেষ্টা করে তখন সেই হুল, সাথের বিষগ্রন্থি বা 'পয়জন গ্ল্যান্ড', আর মৌমাছির পরিপাকতন্ত্র বা 'ডাইজেস্টিভ সিস্টেম'-এর কিছু অংশ, ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গিয়ে শিকারের শরীরে থেকে যায়। এই ছিঁড়ে যাওয়ার পরেও ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড অব্দি পয়জন গ্ল্যান্ড থেকে বিষ ক্রমাগত শিকারের শরীরে ঢুকতে থাকে। কিন্তু সেই মৌমাছি খানিকক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। কলোনীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয় শ্রমিক-মৌমাছি, অথচ তার নিজের প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য! ধাঁধা বৈকি!

আপনি বলতে পারেন, কিসের ধাঁধা হে? যুগ যুগ ধরে মানুষ দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে এসেছে, এখনো দিচ্ছে, আর ভবিষ্যতেও দেবে! এর মধ্যে আবার ধাঁধা কোথায়? কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন, আপনি যাদের উদাহরণ দিচ্ছেন, তারা কিন্তু কেউই কর্মী-মৌমাছির মত প্রজননে অক্ষম নয়। ভাবছেন এর মধ্যে আবার 'প্রজনন' এল কোথা থেকে? আসুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক, প্রজনন করতে পারা বা না পারাটা এই ক্ষেত্রে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ।

হোঁচট খেলেন ডারউইন

ডারউইন-ওয়ালেস প্রস্তাবিত প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ বা 'ন্যাচারাল সিলেকশন' থিওরিই হল আধুনিক জীববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। ৩৫০ কোটি বছর আগে এককোষী প্রাণী থেকে শুরু হয়ে কিভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে আজকের এই জীবজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এই থিওরির ওপর ভর করে সেটা ব্যাখ্যা করা যায়। মোদ্দা কথায় থিওরিটা কাজ করে

এইভাবে: প্রাণীরা প্রজনন করে নিজেদের প্রতিরূপ তৈরী করে। তবে হুবহু নকল তো হয়না, তাই সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। এই পার্থক্যই আবার ভবিষ্যতে ঐ ছানাপোনাদের প্রজননকে প্রভাবিত করতে পারে।

স্বয়ং চার্লস ডারউইনের দেওয়া একটা উদাহরণই একটু সহজ করে নিয়ে দেখতে পারি আমরা। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভেসে আছে যে ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপগুলো, সেখানে দেখা পাবেন একরকমের ভীষণ ছোট আর হালকা পাখির, যাদের বলে 'ফিঞ্চ'। এই ফিঞ্চদের একটা প্রজাতির নাম 'মিডিয়াম গ্রাউন্ড ফিঞ্চ', যাদের প্রধান খাদ্য হল মাটিতে পড়ে থাকা ছোট নরম বীজ। বুঝতেই পারছেন, বেঁচে থাকার জন্য এদের ঠোঁটটা (ভাল বাংলায় চঞ্চু) কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ঠোঁট দিয়েই এরা মাটি থেকে বীজ তুলে নেয়, তারপর সেটা ফাটিয়ে ভেতরের শাঁসটা খায়। দিব্যি যাচ্ছে দিনকাল, এখন ধরে নিন – হঠাৎ জলবায়ু গেল বদলে, শুরু হল খরা, বৃষ্টির আর দেখা নেই! ছোট আর নরম বীজেরও পড়ল আকাল। এখন সব ফিঞ্চের ঠোঁট তো আর একরকম সাইজের ছিলনা, কারো কারো ঠোঁট ছিল একটু বড় আর শক্ত। এবার যাদের ঠোঁট একটু বড় আর শক্ত ছিল, তারা একটু বড় আর শক্ত বীজগুলো ফাটিয়ে খেতে পারল। ফলে বাকিদের তুলনায় তারা খাবার পেল বেশি, অনাহারে মারা গেল কম সংখ্যায়, আর সব মিলিয়ে প্রজননের সুযোগও পেল বেশি। এই একটু বড় আর শক্ত ঠোঁটের পাখিদের ছানাপোনাদেরও হল বড় আর শক্ত ঠোঁট, তাই পরের প্রজন্ম বা 'জেনারেশন'-এ এদের সংখ্যা তুলনায় বেড়ে গেল। তারপরের জেনারেশনে সংখ্যাটা আরও বাড়ল, এইভাবে বাড়তে বাড়তে অনেক জেনারেশন পরে সব পাখিদের ঠোঁটই একটু বড় আর শক্ত হয়ে গেল। বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে বড় আর শক্ত ঠোঁটগুলো 'সিলেক্টেড' হয়ে গেল।

এবার এই বড় আর শক্ত ঠোঁটেরও তো তারতম্য আছে! এদের মধ্যে যাদের ঠোঁট আরেকটু বেশি বড় আর শক্ত, তারা দেখা গেল আরও বেশি সুবিধে পাচ্ছে আর আরও বেশি প্রজনন করছে। তো এই একই প্রক্রিয়ায় এবার আরেকটু বেশি বড় আর শক্ত ঠোঁটেরা সিলেক্টেড হল। এইভাবে চলতে চলতে,

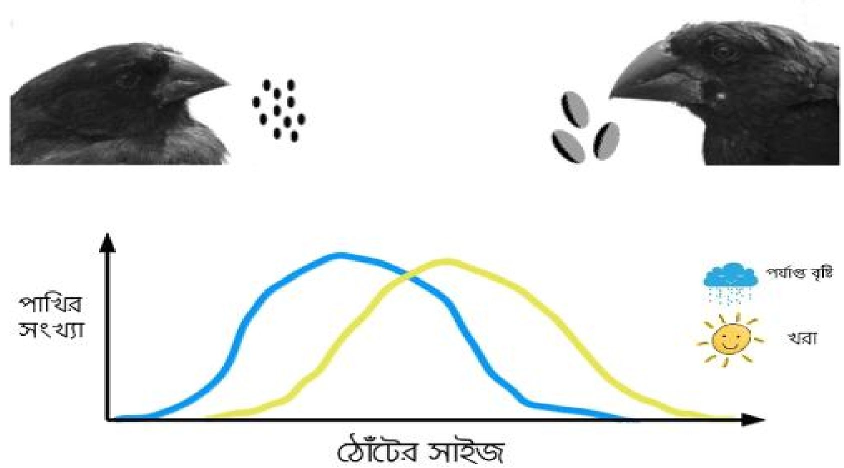

ফিঞ্চ পাখিদের ঠোঁটের বিবর্তন। পর্যাপ্ত বৃষ্টির সময় ছোট ছোট বীজ বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, শুকনো সময়ে পাওয়া যায় বড় সাইজের বীজ। সেই অনুযায়ী পাখিদের ঠোঁটের সাইজের বিন্যাসও কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে সেটা সঙ্গের গ্রাফ-এ দেখান হয়েছে। নীল রং দিয়ে বৃষ্টির আর হলুদ রং দিয়ে খরার মরশুম বোঝান হয়েছে।

এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো জমতে জমতে, অনেক জেনারেশন পরে দেখা গেল হরেগড়ে সমস্ত ফিঞ্চের ঠোঁটই বেশ কিছুটা বড় আর শক্ত হয়ে গেছে[৬]। ন্যাচারাল সিলেকশন অনুযায়ী ঠিক এইভাবেই প্রজাতির মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরী হয়। আবার কখনো এক প্রজাতি থেকে একদল আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন প্রজাতি তৈরী করে।

তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন যে ন্যাচারাল সিলেকশনে প্রজননের ভূমিকাটা মুখ্য। প্রজনন না হলে সিলেকশন হতেই পারবে না। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে কর্মী-মৌমাছিদের এতসব বৈশিষ্ট্য সিলেক্টেড হল কি উপায়ে? প্রজনন করতে না পারলে তো এমনিতেই দুনিয়া থেকে মুছে যাবার কথা। অথচ এই ওয়ার্কাররা কোটি কোটি বছর ধরে দিব্যি টিঁকে আছে। শুধু তাই নয়, এদের খুঁটিয়ে দেখলে দেখবেন, এদের পেটের কাছে রয়েছে মোম তৈরী করার জন্য এক ধরণের গ্ল্যান্ড, ফুলের রেণু সংগ্রহ করার জন্য পিছনের পায়ে রয়েছে বিশেষ ধরণের 'পোলেন বাস্কেট'। খাবারের উৎসের সুলুক-সন্ধান সহকর্মীদের জানিয়ে দেবার জন্য নিখুঁত একটা 'ডান্স ল্যাঙ্গোএজ' এরা জন্ম থেকেই জানে[৭]। এসবের মধ্যেই রয়েছে অন্যের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার প্রবৃত্তি। রাণী-মৌমাছির মধ্যে কিন্তু এসব গুণের কোনটাই নেই! তাহলে কর্মীদের মধ্যে এই গুণগুলো এল কোথা থেকে? এল তো এল, এত নিখুঁত হল কি করে? যেমন, এটা তো আর বলা যাবেনা যে কর্মীদের মধ্যে যাদের পোলেন বাস্কেটগুলো অন্যদের থেকে উন্নত তারা বেশি প্রজনন করল আর সিলেক্টেড হয়ে গেল। এটাও বলা যাবেনা যে যারা নিজের জীবন বেশি বিলিয়ে দিল তারা বেশি প্রজনন করে সিলেক্টেড হল। কারণ কর্মী-মৌমাছিরা তো প্রজনন করতেই পারেনা! পারে একমাত্র রাণী-মৌমাছি, আর ন্যাচারাল সিলেকশন কাজ করবে কেবল রাণীর ওপরই!

সমস্যাটা যে ডারউইনকেও ফ্যাসাদে ফেলেছিল সেটা বলাই বাহুল্য। এই একটা উদাহরণই পুরো ন্যাচারাল সিলেকশন থিওরিটাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারত। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত 'অরিজিন অফ স্পিসিস' বইতে ডারউইন নিজেই লিখে গেছেন এই সমস্যার কথা[৮]। একটা কাজ চালানোর মত ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন সেখানে, কিন্তু ডারউইন নিজেই সেই ব্যাখ্যায় কতটা সন্তুষ্ট ছিলেন তা নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই ধাঁধার প্রথম একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো প্রায় একশ বছর।

হ্যালডেনের সংকেত

আসুন এবারে আমরা ফিরে যাই গল্পের শুরুতে, জে.বি.এস. হ্যালডেন (১৮৯২-১৯৬৪) এর সেই অদ্ভুত জবানিতে। হ্যালডেনের নামে প্রচলিত ওই গল্পটা সত্যি কিনা, মানে হ্যালডেন কথাটা সত্যিই কাউকে ওইরকম ভাবে বলেছিলেন কিনা, সেটা সঠিক জানা যায়না। তবে ১৯৫৫ সালে ছাপা এক গবেষণাপত্রে[৯] তিনি এই কথাগুলোই একটু অন্যভাবে বলে গেছেন। মাঝের একশ বছরে বংশগতির ধারক ও বাহক 'জিন' সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গেছে, ন্যাচারাল সিলেকশনকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে জিনের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে।
এই ধারণা অনুযায়ী প্রাণীদের প্রতিটা বৈশিষ্ট্য বা 'ট্রেট'-এর জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা জিন বা জিনসমষ্টি। কোনো বৈশিষ্ট্য বা ট্রেট সিলেক্টেড হয়ে যাওয়ার মানে হল সেই জনগোষ্ঠী বা 'পপুলেশন'-এ ওই ট্রেট-এর জন্য নির্দিষ্ট জিনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাওয়া। সন্তান-সন্ততির

মধ্যে বাবা-মায়ের জিনের প্রতিরূপ থাকে, তাই প্রজননের মানেই হল পপুলেশনে নিজের জিনের সংখ্যা বাড়ানো। ন্যাচারাল সিলেকশনের এই জিন-ভিত্তিক ধারণার কথা মাথায় রেখেই হ্যালডেন এই জটিল ধাঁধার সমাধানের কথা ভেবেছিলেন। প্রধানত হ্যালডেনের এই সংকেতের ওপর ভিত্তি করেই ১৯৬৪ সালে বৃটিশ প্রকৃতিবিদ ডব্লু.ডি. হ্যামিলটন (১৯৩৬-২০০০) পরপর দুটো গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যাতে তিনি আলট্রুইজম-এর রহস্য ব্যাখ্যা করেন[১০]।

হ্যামিলটন বললেন, পপুলেশনে নিজের জিনের সংখ্যা যে শুধু প্রজনন করলেই বাড়বে এমন তো নয়। যারা আপনার রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় বা 'জেনেটিক রিলেটিভ', তাদের মধ্যেও আপনার জিনের প্রতিরূপ আছে। তাই তাদের যদি আপনি বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন, তাহলেও পপুলেশনে আপনার জিনের সংখ্যা বাড়তে পারে। আপনি আপনার জিনের সংখ্যা কত বাড়াতে পারছেন তার মাপকাঠিই হল আপনার 'ফিটনেস'। হ্যামিলটনের থিওরি অনুযায়ী, প্রজনন ক্ষমতা নেই এরকম কোনো ব্যক্তিও জ্ঞাতিগুষ্ঠির মাধ্যমে কিছু 'ফিটনেস' পেয়ে যেতেই পারে, আর নিজের জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই থিওরির নাম দিয়েছেন 'কিন সিলেকশন থিওরি', 'কিন' অর্থে জ্ঞাতি।

কিন্তু কীভাবে মাপা যাবে এই ফিটনেস? সেই অঙ্কেই যাবো আমরা পরের অংশে। আর হ্যামিল্টনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শ্রমিক-মৌমাছিদের আত্মত্যাগের রহস্যভেদ কিভাবে সম্ভব হলো, সেই গল্পও বলবো।

|| আত্মীয়তার হিসেবনিকেশ ||

আপনি আপনার জিনের সংখ্যা কত বাড়াতে পারছেন তার মাপকাঠিই হল আপনার 'ফিটনেস'। হ্যামিলটনের থিওরি অনুযায়ী, প্রজনন ক্ষমতা নেই এরকম কোনো ব্যক্তিও জ্ঞাতিগুষ্ঠির মাধ্যমে কিছু 'ফিটনেস' পেয়ে যেতেই পারে, আর নিজের জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই থিওরির নাম দিয়েছেন 'কিন সিলেকশন থিওরি', 'কিন' অর্থে জ্ঞাতি। কিন্তু কীভাবে মাপা যাবে এই ফিটনেস?

প্রথমেই দেখতে হবে জ্ঞাতিদের সাথে আপনি কতটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত বা 'রিলেটেড'। মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গোটা জিনোমটা[১১] তৈরী হয় বাবা আর মা, দুজনের থেকেই অর্ধেক অংশের করে জিন নিয়ে। তাই এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সন্তানের সঙ্গে জেনেটিক রিলেটেডনেস বা সম্পর্ক হল ১/২। তেমনি ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কও ১/২, নাতি-নাতনি, ভাইপো-ভাইঝি, বোনপো-বোনঝিদের সঙ্গে ১/৪ আর যাবতীয় খুড়তুতো, জ্যাঠতুত, মামাতো, মাসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে ১/৮। এখন আপনি যদি আপনার তিনজন ভাইপোকে লালন-পালন করেন, তাহলে আপনার ফিটনেস হবে ৩ X ১/৪ = ৩/৪, যদি পাঁচজন মামাতো বোনের দেখাশোনা করেন তাহলে আপনার ফিটনেস হবে ৫ X ১/৮ = ৫/৮, এইরকম। এই সমস্ত ফিটনেস যোগ করে হিসেবটা যা দাঁড়ায় সেটাই হল আপনার 'ইনক্লুসিভ ফিটনেস'। আর আপনার এই 'ইনক্লুসিভ ফিটনেস' বেড়ে যাওয়া মানেই হল আপনার বৈশিষ্ট্যগুলো সিলেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা বাড়া।

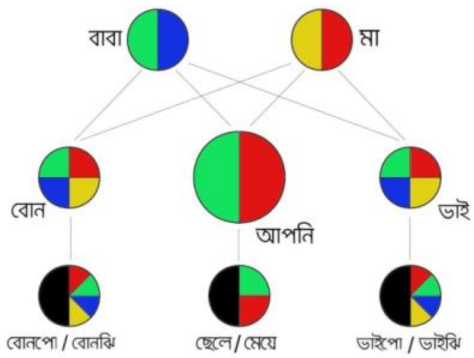

'জেনেটিক রিলেটেডনেস' বা সম্পর্কের সরলীকৃত চিত্রণ। ছবিতে একই জিনের 'কপি' বা প্রতিরূপের রং একই। ছবিতে উপস্থিত নেই এমন ব্যক্তির জিন বোঝাতেই শুধু কালো রং ব্যবহার করা হয়েছে। জেনেটিক সম্পর্ক দেখা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিটির দৃষ্টিকোণ থেকে। মানুষের ক্ষেত্রে জেনেটিক সম্পর্ক দেখানো হচ্ছে এখানে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হচ্ছেন আপনি। সমস্ত স্তন্যপায়ী সহ বেশির ভাগ প্রাণীর জেনেটিক সম্পর্কই এইরকম।

নীচের চার্টে স্ত্রী পুরুষ দুজনের দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক কত তা বলা আছে।

লিঙ্গ	মা / বাবা	ভাই / বোন	ছেলে / মেয়ে	ভাইপো / ভাইঝি	বোনপো / বোনঝি
স্ত্রী	১/২	১/২	১/২	১/৪	১/৪
পুরুষ	১/২	১/২	১/২	১/৪	১/৪

চলুন এবারে বুঝে দেখি হ্যালডেন সেই সাংকেতিক জবানিতে ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন। হ্যালডেন নিজের একজন বা দুজন ভাইয়ের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে চাননি। বলেছিলেন, তিনজন বা তার বেশি ভাইকে বাঁচানোর সুযোগ থাকলে তবেই তিনি সেই ঝুঁকি নিতে রাজি আছেন। এখানে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার অর্থ হল নিজের পুরো জিনোমটাকেই নষ্ট হতে দেওয়ার ঝুঁকি। আর সকলেরই তো নিজের সাথে নিজের জেনেটিক সম্পর্ক ১! তাই হ্যালডেন সেটা হারানোর ঝুঁকি তখনই নিতে পারেন যখন তিন বা তার বেশি সংখ্যক ভাইকে বাঁচানোর সুযোগ থাকবে, যাতে করে ক্ষতিটা পুষিয়ে যায়। কারণ, ভাইয়ের সাথে জেনেটিক সম্পর্ক ১/২, তাকে অন্তত তিন দিয়ে গুণ করলে তবেই সেটা এক এর চেয়ে বেশি হবে।

হ্যালডেনই এটা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। কিছু কঠিন শর্ত পূরণ হলে, নিজের জীবন দিয়ে অন্যের জীবন বাঁচানোর মত নিঃস্বার্থ প্রকৃতিও ন্যাচারাল সিলেকশন-এর মাধ্যমে একটা প্রজন্ম থেকে আরেকটাতে চলে আসতে পারে।

হ্যামিলটনের বিধান

এই ছোট্ট অথচ সরল হিসেবটাই অঙ্কের আকারে প্রকাশ করেছিলেন ডব্লু.ডি. ওরফে বিল হ্যামিলটন। ধরুন, আপনার শরীরে এমন কোনো জিন রয়েছে যার ওপর নির্ভর করছে আপনি একজন ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেবেন কি দেবেন না। ঝাঁপ দিলে আপনার ক্ষতি বা 'কস্ট' (cost)-এর পরিমাণ c, ডুবন্ত মানুষের লাভ বা 'বেনিফিট' (benefit)-এর পরিমাণ b, আর আপনার ও ডুবন্ত মানুষের মধ্যে জেনেটিক সম্পর্ক r। সেক্ষেত্রে পপুলেশনে আপনার জিনের সংখ্যা বাড়তে পারে যদি

$$b/c > 1/r$$

শর্তটা পূরণ হয়। এই অসমীকরণেরই পোষাকি নাম হল 'হ্যামিলটন'স রুল'। b আর c কিন্তু মাপতে হবে ফিটনেসের এককে। যেমন, শুরুর উদাহরণে হ্যালডেন নিজের একটা জিনোম খুইয়ে (c=১) অন্তত তিনজন ভাইয়ের জিনোম বাঁচাতে চান (b=৩), কারণ ভাইয়ের সাথের তার জেনেটিক সম্পর্ক r=১/২। নিঃস্বার্থ প্রকৃতির ধাঁধাটার সমাধানে হ্যামিলটনের এই বিধানই হল বিজ্ঞানীদের প্রধান হাতিয়ার।

হ্যামিলটনের বিধান থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় যে প্রাণীজগতে নিঃস্বার্থ চরিত্রের উদ্ভব হওয়া বেশ কঠিন। আপনার সবচেয়ে নিকটাত্মীয় হল আপনার সন্তান আর ভাইবোনরা, যাদের সঙ্গে আপনার জেনেটিক সম্পর্ক ১/২। মনে করুন আপনার মধ্যে দু' ধরণের জিন রয়েছে: এক ধরণের জিনের প্রভাবে আপনি নিজে সন্তানের জন্ম দিতে চান (স্বার্থপর বা নন-আল্ট্রুইস্ট), অন্য জিনটার প্রভাবে আপনি নিজের ভাইবোনদের মানুষ করতে চান (নিঃস্বার্থ বা আল্ট্রুইস্ট)। ধরে নিচ্ছি আপনি দুজন সন্তানকে জন্ম দিয়ে মানুষ করে তোলার ক্ষমতা রাখেন। এখন আপনি যদি চান আপনার নিঃস্বার্থ জিনের সংখ্যা তুলনায় বাড়ুক, তাহলে আপনাকে কম করে তিনটে ভাই বা বোনকে মানুষ করতে হবে! কাজেই আপনাকে খাটতে হবে কিন্তু অনেক বেশি !

সেক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ আচরণের উদ্ভবের জন্য এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে চলে আসছে যে আপনি বেশি খাটতে পারেন কিনা। কাজেই প্রাণীজগতে নিঃস্বার্থ আচরণ যে বিরল, তাতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে কীটপতঙ্গের দুনিয়ায় এটা এমন কিছু বিরল নয়। মৌমাছি তো বটেই, প্রায় সমস্ত পিঁপড়ে আর বেশির ভাগ বোলতাই খুবই সামাজিক। আর তাদের সবার বাসাতেই আল্ট্রুইস্ট ওয়ার্কারদের দেখা মেলে। কেন এদের মধ্যেই সোশ্যালিটির ছড়াছড়ি? এর উত্তরটাও অংশতঃ লুকিয়ে আছে হ্যামিলটনের দেওয়া বিধানের মধ্যেই।

নিঃস্বার্থ আচরণের রহস্যভেদ

প্রাণীজগতের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী পিঁপড়ে, মৌমাছি আর বোলতা, এই তিন প্রাণীরই স্থান একটা বিশেষ গ্রুপে, যার নাম 'হাইমেনপটেরা'। এই গ্রুপের নানা বিশেষত্বের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এদের প্রজননের পদ্ধতি।

এদের রাণীদের একটা বিশেষ ক্ষমতা থাকে, এরা চাইলেই ইচ্ছামত ছেলে বা মেয়ে সন্তানের জন্ম দিতে পারে। এরা নিজেদের শরীরের মধ্যে একটা থলিতে করে শুক্রাণু জমিয়ে রেখে দিতে পারে দিনের পর দিন। তারপর ইচ্ছেমত সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। যখন রাণী মেয়ে সন্তান (কর্মী কিংবা ভবিষ্যতের রাণী) চায়, শুক্রাণুর থলির মুখ একটু ফাঁক করে দেয় – কিছু শুক্রাণু বেরিয়ে এসে ডিমের নিষেক বা 'ফার্টিলাইজেশন' করে। আর যখন রাণী ছেলের (ড্রোন) জন্ম দেবে ভাবে, শুক্রাণুর থলির মুখ শক্ত করে বন্ধ রেখে দেয়, ফলে ডিমের নিষেক ঘটে না। নিষিক্ত ডিম থেকে মেয়ে আর অনিষিক্ত ডিম থেকে ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। কাজেই হাইমেনপটেরা গ্রুপের মেয়েদের দু'-সেট ক্রোমোজোম[১২] থাকে, একটা আসে মার ডিম্বাণু থেকে, অন্যটা বাবার শুক্রাণু থেকে। কিন্তু ছেলেদের ক্রোমোজোম থাকে মাত্র এক-সেট, সেটা আসে শুধুমাত্র মার ডিম্বাণু থেকেই।

হাইমেনপটেরা-র এই অসম প্রজনন ব্যবস্থার ফলে জেনেটিক সম্পর্কের সব হিসেব উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। মায়েদের সাথে নিজের মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক ১/২-ই থাকে। কিন্তু একই বাবা মায়ের থেকে জন্মান দুই বোনের মধ্যে সম্পর্ক বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩/৪। তার মানে, একজন কর্মী-মৌমাছি নিজে সন্তানের জন্ম না দিয়ে যদি নিজের বোনের দেখাশোনা করে, তাহলে সে দুদিক দিয়ে সুবিধে পেয়ে যাচ্ছে! এক তো সে ফিটনেস পাচ্ছে বেশি, অন্যদিকে বাকিদের তুলনায় তাকে খাটতেও হচ্ছে কম! তার জিনের সংখ্যা তুলনায় বাড়ছে, অথচ তাকে বেশি খাটতেও হচ্ছেনা! কর্মী-মৌমাছির মধ্যে যদি 'নিঃস্বার্থ' আর 'স্বার্থপর', এই দু' ধরণের জিনই থাকে, তাহলে বুঝতেই পারছেন, হাইমেনপটেরার এই বিশেষ প্রজনন ব্যবস্থার ফলে একই খাটুনিতে নিঃস্বার্থ জিনটা সংখ্যায় বাড়বে বেশি হারে। অনেক প্রজন্ম পরে দেখা যাবে সবাই নিঃস্বার্থ হয়ে গেছে। ঠিক এই কারণেই বাকি প্রাণীজগতের তুলনায় হাইমেনপটেরাতে নিঃস্বার্থ আচরণের উদ্ভবের সুযোগ অনেক বেশি।

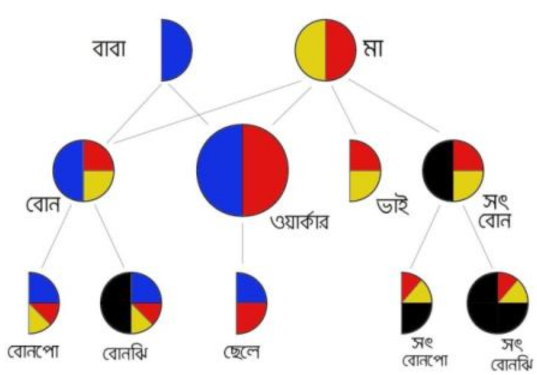

হাইমেনপটেরা গ্রুপে 'জেনেটিক রিলেটেডনেস' বা সম্পর্কের সরলীকৃত চিত্রণ। কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হল ওয়ার্কার। খেয়াল করুন এখানে পুরুষদের জিনের পরিমাণ স্ত্রীদের অর্ধেক।

পরের চার্টে স্ত্রী পুরুষ দুজনের দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক কত তা বলা আছে।

লিঙ্গ	কন্যা	পুত্র	মা	বাবা	বোন	ভাই
স্ত্রী	১/২	১/২	১/২	১/২	৩/৪	১/৪
পুরুষ	১	-	১	-	১/২	১/২

নিঃস্বার্থ এই জগতে

আপনি প্রশ্ন তুলতেই পারেন, হাইমেনপটেরার বাইরে কি তাহলে নিঃস্বার্থ আচরণ নেই? মৌমাছির মত চরম না হলেও বাকি প্রাণীজগৎ জুড়ে সমাজবদ্ধ বসবাসের অনেক নজিরই চোখে পড়ে। এই থিওরি কি সেখানেও চলবে? এই যেমন সিংহই একটা সামাজিক প্রাণী। সিংহসমাজেও কি - আত্মীয়দের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায়? সিংহের প্রজনন পদ্ধতি তো মানুষেরই মত, সে তো আর মৌমাছির মত জেনেটিক সম্পর্কের সুবিধে পায় না। তাহলে সিংহরা একসাথে থাকে কেন?

মনে করে দেখুন, সিংহের একেকটা দলে এক বা একের বেশি পূর্ণবয়স্ক সিংহ থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, ছোট দলগুলোতে সিংহরা সবাই মোটামুটি একই হারে প্রজনন করে, প্রায় একই সংখ্যায় সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু বড় দলগুলোতে প্রধানত একটা সিংহকেই প্রজনন করতে দেখা যায়, দলের বেশির ভাগ ছানাপোনার বাবা সেই। মজার - ব্যাপারটা হল, এটাও দেখা গেছে যে ছোট ছোট দলের সিংহদের তুলনায় বড় দলগুলোতে সিংহদের মধ্যে সম্পর্ক বেশি - মানে বড় দলগুলোতে সিংহরা পরস্পরের বেশি কাছের আত্মীয়[১৩]। অন্যভাবে

বলতে গেলে, নিজে প্রজনন বন্ধ রেখে দলের সঙ্গী-সাথীদের সাহায্য করতে সিংহের খুব একটা আপত্তি জ্ঞাতিগুষ্ঠিরা -নেই যদি সেই দলে তার আত্মীয়স্বজন থাকে। কিন্তু সেটা না হলে এই স্বার্থত্যাগ করতে সে অর্থা !একটুও রাজি নয়ৎ এখানেও সেই 'কিন সিলেকশন'-এর ছায়া।

আফ্রিকা থেকে এবার চলে আসুন উত্তরপশ্চিম - আমেরিকাতে। এখানে দেখা পাবেন 'বেল্ডিং'স গ্রাউন্ড স্কুইরেল' বলে একধরনের কাঠবিড়ালির, যারা শিকারী নেকড়ে, বেজি বা ঈগলদের দেখতে পেলেই চিৎকার করে বাকিদের সাবধান করে দেয়। তাদের এই 'অ্যালার্ম কল' শুনে বাকিরা পালিয়ে গেলেও স্কুইরেল নিজে কিন্তু প্রায়শই শিকারীর চোখে পড়ে যায়, হয়ত সবার আগে মারাও পড়ে। স্কুইরেল নিজেই আগে পালিয়ে যায়না কেন? গবেষণায় দেখা গেছে স্কুইরেল এই 'অ্যালার্ম কল'টা তখনই দেয় যখন তার জ্ঞাতিগুষ্ঠিরা আশেপাশে থাকে। অর্থাৎ, নিজের জীবনের ঝুঁকিটা স্কুইরেল তখনই নেয় যখন আত্মীয়দের মাধ্যমে কিছু ফিটনেস পাবার সুযোগ আছে[১৪]।

আনুবীক্ষণিক জগতেও উদাহরণ পেয়ে যাবেন। এককোষী অ্যামিবা 'স্লাইম মোল্ড'কে দেখুন - মাটিতে ব্যাকটেরিয়া খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। এমনিতে এরা সোশ্যাল নয়, একা একাই থাকে। কিন্তু একজায়গায় খাবার ফুরিয়ে এলে, যখন বাঁচতে গেলে দূরে কোথাও যেতেই হবে, তখন অনেকে মিলে একজায়গায় জড়ো হয়ে একটা মণ্ড তৈরী করে। সেখান থেকে তৈরী হয় 'স্টক' বা লম্বা ডাঁটার মত একটা অংশ, তাতে থাকে কিছু মৃত অ্যামিবা। আর সেই ডাঁটার মাথায় থাকে জ্যান্ত অ্যামিবার একটা 'স্পোর' বা গুটি। কিছু অ্যামিবা আত্মহত্যা করে ওই 'স্টক' অংশটা তৈরী করে। ফলে 'স্পোর' অংশের অ্যামিবাদের দূরে কোথাও বাহিত হয়ে গিয়ে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে অ্যামিবার এই চরম স্বার্থত্যাগের পেছনে রয়েছে নিজের 'ক্লোন'-দের বাঁচানোর চেষ্টা[১৫]! নিজের ক্ষতি করে অন্যের উপকারের এমনি অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের চারপাশের জীবজগতে। আর তার সাথেই জড়িয়ে রয়েছে 'কিন সিলেকশন' থিওরির সাফল্য।

তাহলে কি রহস্যের অবসান হলো? বিজ্ঞানের ইতিহাসে সব সময়েই দেখতে পাবেন যখনই কোনো একটা ধাঁধার সমাধান হয়, আবার সেখান থেকেই শুরু হয়ে যায় নতুন কোনো ধাঁধা। পরের অংশে আমরা দেখবো, কিন সিলেকশন তত্ত্ব কি নতুন ধাঁধার সৃষ্টি করলো আর বিজ্ঞানীরা তার সমাধানে কতদূর এগিয়েছেন।

|| রহস্যের নতুন প্যাঁচ ||

কিন্তু, এতেই কি সব রহস্যের সমাধান হলো? বিজ্ঞানের ইতিহাসে সব সময়েই দেখতে পাবেন যখনই কোনো একটা ধাঁধার সমাধান হয়, আবার সেখান থেকেই শুরু হয়ে যায় নতুন কোনো ধাঁধা! মনে করে দেখুন, হাইমেনপটেরা-তে দুই বোনের মধ্যে জেনেটিক সম্পর্ক ৩/৪। কিন্তু সেটা কেবল তখনই যখন সেই বোনেরা একই বাবা মায়ের সন্তান ! দুই সৎ বোন (একই মা কিন্তু আলাদা বাবা)-এর মধ্যে জেনেটিক সম্পর্ক অনেক কম, মোটে ১/৪। পরীক্ষা করলে কিন্তু রাণীদের শুক্রাণুর থলিতে প্রায়শই একের বেশি পুরুষের শুক্রাণু পাওয়া যায়। তার মানে হল, কর্মীদের মধ্যে জেনেটিক সম্পর্ক যতটা বেশি ভাবা হচ্ছিল, আসলে ততটা নয়।

অনেক প্রজাতিতে আবার কলোনীর হাতবদলও হয় – এবার এক রাণী গিয়ে যদি তার মেয়ে নতুন রাণী হয়, তাহলে নতুন জন্মানো কর্মীরা হবে পুরনো কর্মীদের বোনঝি। জেনেটিক সম্পর্কও যাবে অনেক কমে ! এইসব কারণে বাস্তবে কর্মীদের মধ্যে গড় জেনেটিক সম্পর্ক ৩/৪ তো থাকেই না, ১/২-এরও অনেক কম হয়। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে কর্মীরা কলোনীতে পড়ে আছে কেন? বেরিয়ে গিয়ে নিজেরা বাসা তৈরী করে ডিম পাড়লে তো অনেক বেশি ফিটনেস পাবে!

লক্ষ্য করে দেখুন, হ্যামিলটনের বিধানে কিন্তু জেনেটিক সম্পর্ক ছাড়া আরো দুটো ফ্যাক্টর আছে, লাভ বা বেনিফিট আর ক্ষতি বা কষ্ট এই দুটোর তারতম্যের জন্যেও কিন্তু শর্তটা পূরণ হয়ে যেতে পারে। একজন কর্মীকে কলোনী ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে, নতুন বাসা তৈরী করে, ডিম পেড়ে, সেই ছানাকে খাবার যুগিয়ে বড় করতে গেলে হাজারো হ্যাপা পোয়াতে হবে। আর ছানা বড় হবার আগে সেই কর্মী যদি নিজেই কারোর খাবার হয়ে যায়, তাহলে তো পুরো খাটুনিটাই মাটি। তার চেয়ে নিজের সন্তানের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে (ক্ষতি বা কস্ট) সে যদি কলোনীতে থেকে যায়, তাহলে অনেক কম খাটুনি খেটে অনেক বেশি সংখ্যায় জ্ঞাতিদের দেখাশোনা করতে পারবে। জ্ঞাতিদের সঙ্গে জেনেটিক সম্পর্ক যদি কমও হয়, কুছ পরোয়া নেহি, তাদের সংখ্যা তো অনেক বেশি, তাই অনেক বেশি ফিটনেস (লাভ বা বেনিফিট) পাওয়াও তার নিশ্চিত।

মুশকিল হল, বাস্তবে এই আচার আচরণের লাভ আর ক্ষতিগুলো মাপতে পারাটা ভীষণ কঠিন। তাই এই তত্ত্বটা কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেখানোও কঠিন। আনন্দের কথা, এই দুরূহ কাজটাই বাস্তবে করে দেখিয়েছেন একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রফেসর রাঘবেন্দ্র গদগকর, এই ভারতের মাটিতে বসেই। বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ বিশেষ প্রজাতির এক বোলতা, 'রোপালিডিয়া মার্জিনাটা'-র ওপর দীর্ঘ গবেষণায় তিনি এই তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করেছেন। নিঃস্বার্থ আচরণের ধাঁধার সমাধানে তাঁর এই 'অ্যাসিয়োর্ড ফিটনেস রিটার্ন' তত্ত্ব এখন একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত।

আর মানুষ? সে তো নিজের একটা ভাইয়ের জন্যই জীবনের ঝুঁকি নিতে রাজি! এমনকি কখনো হয়ত পাড়াতুতো ভাইয়ের জন্যও! কোথায় গেল এখানে 'কিন সিলেকশন' তত্ত্ব? আসলে আপনি তো দেখলেনই, নিঃস্বার্থ আচরণের লাভ আর ক্ষতি মাপা কতটা কঠিন হতে পারে! এখনো পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকটা প্রাণীর ক্ষেত্রেই এই চেষ্টাটা করা গেছে। তাছাড়া পশুপাখিদের ওপর যে ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায়, মানুষের ওপর সেটা অসম্ভব! তাই মানুষের ক্ষেত্রে খুব সফলভাবে এসব মাপামাপি করে ওঠা যায়নি।

আরো একটা জরুরী ব্যাপার ভুললে চলবেনা। সহজ করে ভাবার জন্য এটা বলা হয় বটে যে নিঃস্বার্থ আচরণটা শুধুমাত্র কিছু জিনের প্রভাবে হচ্ছে। আসলে কিন্তু মানুষ কোন পরিস্থিতিতে পড়লে কী আচরণ করবে, সেটা আরো অনেক কিছুর ওপরই নির্ভর করে। এই যেমন তার বড় হয়ে ওঠার পরিবেশ, তার শিক্ষা-দীক্ষা, বংশানুক্রমে পাওয়া জ্ঞান, ইত্যাদি। এককথায় বলতে গেলে তার 'সংস্কৃতি'টাও এসব ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত কিছুকে মিলিয়ে মিশিয়ে কোনো একটা

ঠিকঠাক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখনো দুরস্ত। তবে দিশাটা এখন অন্তত চোখে দেখা যাচ্ছে।

দিনবদলের পালা?

নিঃস্বার্থ আচরণের ধাঁধার সমাধান তো ডারউইন বা ওয়ালেস কেউই করে যেতে পারেননি। করেছেন হ্যালডেন আর হ্যামিলটন, তাও কিনা একশ বছর পরে! আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন, তাহলে কি ন্যাচারাল সিলেকশন তত্ত্বটাই ভুল ছিল? নইলে আবার একটা নতুন তত্ত্বের দরকার পড়লো কেন? কিন্তু ভেবে দেখুন, 'ন্যাচারাল সিলেকশন' অনুযায়ী নিজের বৈশিষ্ট্যগুলোর 'সিলেকশন' মানে হল নিজের সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে পাওয়া 'ফিটনেস' বেড়ে যাওয়া। 'কিন সিলেকশন' থিওরিতে সেই ধারণাটাই আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। বলা হলো যে নিঃস্বার্থ আচরণের বেলায় 'সিলেকশন' মানে হল নিজের 'ইনক্লুসিভ ফিটনেস' বেড়ে যাওয়া। কাজেই একে ন্যাচারাল সিলেকশনের একটা সম্পূরক তত্ত্ব বা 'সাপ্লিমেন্টারী থিওরি' বলা চলতে পারে।

আসলে কিন্তু ন্যাচারাল সিলেকশন তত্ত্ব থেকে শুরু করে অঙ্ক কষেও এই 'কিন সিলেকশন' তত্ত্বে পৌছনো যায়। তবে সেই অঙ্কটা কষা খুব কঠিন। ইনক্লুসিভ ফিটনেসের ধারণা বা 'কনসেপ্ট'-টা সেই অঙ্কটাকে অনেক সোজা করে দেয়। আর সেই কারণেই এই তত্ত্বের চাহিদা।

তবে সেই কঠিন অঙ্কটা কষা হয়েছে খুব সম্প্রতি। সেটা কষেই বিজ্ঞানীমহলে হইচই ফেলে দিয়েছেন নবীন মার্কিন গবেষক মার্টিন নোওয়াক। তার ক্যালকুলেশনের ফলে এখন 'কিন সিলেকশন' থিওরির ভবিষ্যত নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে।

২০১০ সালে নোওয়াক এবং উইলসন জনপ্রিয় বিজ্ঞানপত্রিকা 'নেচার'-এ এই গবেষণাপত্র ছাপান[১৬]। মজার ব্যাপারটা হল, এই কাজে নোওয়াক-এর সাথী উইলসন হলেন আসলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের জগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব ই.ও. উইলসন (১৯২৯-)। যিনি 'কিন সিলেকশন' তত্ত্বের প্রস্তাবনার পর থেকে তাকে জনপ্রিয় করার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এটা সত্যি যে 'কিন সিলেকশন' তত্ত্বের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। খুব নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতেই এই তত্ত্ব কাজে লাগান যায়। এই সীমাবদ্ধতাগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে নোওয়াক আর উইলসন দেখান যে, নিঃস্বার্থ আচরণের ধাঁধার সমাধানে এই তত্ত্বের কোনো প্রয়োজন নেই, ডারউইন-ওয়ালেস প্রস্তাবিত ন্যাচারাল সিলেকশন তত্ত্বই এর জন্য যথেষ্ট এবং সেখানে এই সীমাবদ্ধতাগুলোও নেই।

এই গবেষণাপত্র নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। গোটা বিজ্ঞানীমহল দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়, এমনকি সই সংগ্রহ করে প্রতিবাদপত্রও যায় নেচার-এর দপ্তরে! আর এভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে তার নিজের গতিতে। যদি ভবিষ্যতে 'কিন সিলেকশন' তত্ত্বের ঠাঁই হয়ওবা আস্তাকুঁড়ে, একথা কখনই ভোলা যাবেনা যে এই তত্ত্বই প্রথম দেখায় কিভাবে ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে নিঃস্বার্থ আচরণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর তাই নিঃস্বার্থ আচরণের ধাঁধার প্রাথমিক সমাধানের জন্য হ্যালডেন এবং হ্যামিলটন, দুজনকেই ইতিহাস মনে রাখবে।

তথ্যসূত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি:

[১] বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব জে.বি.এস. হ্যালডেন (১৮৯২-১৯৬৪) প্রধানত ছিলেন জীববিজ্ঞানী আর পরিসংখ্যানবিদ। ম্যালেরিয়া রোগের জেনেটিক উৎস এবং মহাবিশ্বে প্রাণের উদ্ভব নিয়ে তিনি প্রচুর গবেষণা করে গেছেন। বামপন্থী ভাবধারায় দীক্ষিত, দূরদর্শী এই বিজ্ঞানী ছিলেন জন্মসূত্রে বৃটিশ, পরবর্তীকালে ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে এখানেই বসবাস করেছেন। হ্যালডেনের বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আরো জানতে চাইলে এই লেখাটি পড়ুন।

[২] ১৯৭২ সালের আগে ভারতের জাতীয় পশু ছিল সিংহ।

[৩] সাভানা বলতে বোঝায় এক বিশেষ ধরণের তৃণভূমি, বড় গাছ থাকলেও সেগুলো এমন দূরে দূরে থাকে যে ডালপালা আর পাতা দিয়ে আকাশ ঢাকা পড়ে না।

[৪] ভালুক সলিটারী, হাতি সোশ্যাল।

[৫] মিলনের ক্ষমতা নেই বলে ওয়ার্কারদের ডিম হয় অনিষিক্ত, তা' থেকে শুধু ড্রোন জন্মায়। পরের অংশে 'আলট্রুইজমের রহস্যভেদ' পরিচ্ছদে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা আছে।

[৬] পিটার আর রোসমেরি গ্রান্ট নামের এক বৃটিশ বিজ্ঞানী-দম্পতি এই ফিঞ্চদের নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তাদের গবেষণাপত্রগুলো ছাড়াও এই বিষয়ে আরো রোমাঞ্চকর তথ্য পাওয়া যাবে জোনাথন ওয়েনারের লেখা 'The beak of the finch: A story of evolution in our time' বইতে। বইটি ১৯৯৫ সালে নন-ফিকশন বিভাগে পুলিৎজার পুরস্কার পায়।

[৭] মৌমাছির ডান্স ল্যাঙ্গোয়েজের রহস্য আবিষ্কার করার জন্য ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান অস্ট্রিয়ার জীববিজ্ঞানী কার্ল ফন ফ্রিশ।

[৮] ডারউইনের ভাষায় হানি বী ওয়ার্কাররা হল "the one special difficulty, which first appeared to me insuperable, and actually fatal to my whole theory" – On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, Reprinted 1998, Modern Library, New York, NY (First published in 1859)।

[৯] J.B.S. Haldane (1955) Population genetics, *New Biology* 18: 34-51

[১০] W.D. Hamilton (1964) The genetical evolution of social behaviour I & II, *Journal of Theoretical Biology* **7**, 1-16 & 17-52.

[১১] কোনো প্রাণীর সমস্ত জেনেটিক উপাদানগুলোকে একসাথে 'জিনোম' বলে। তাই জিনোম বলতে প্রাণীর সমস্ত জিন তো বোঝায়ই, তা ছাড়াও আরো কিছু 'নন-কোডিং' অংশ, যেগুলোতে কোনো প্রোটিন তৈরির সংকেত থাকেনা। প্রাণীদের শরীরের সমস্ত সাধারণ কোষের নিউক্লিয়াসে তাদের জিনোম-এর একটা করে প্রতিরূপ থাকে।

[১২] কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই ক্রোমোজম-অংশেই জিনগুলো গুটিয়ে পাকিয়ে ছোট্ট হয়ে বসে থাকে।

[১৩] C. Packer et. al. (1991) Why lions form groups: food is not enough. *American Naturalist* **136**, 1-19

[১৪] P.W. Sherman (1977) Nepotism and the evolution of alarm calls, *Science* **197**, 1246-1453

[১৫] M.J. DeAngelo et. al. (1990) Altruism, selfishness, and heterocytosis in cellular slime molds, *Ethology Ecology & Evolution* **2**, 439-443

[১৬] M. Nowak *et. al.* (2010) The evolution of eusociality, *Nature* **466**, 1057-1062.

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

লেখক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ, কলকাতা-র একজন সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট।

প্রচ্ছদের ছবি:

হ্যালডেনের কাহিনীর চিত্ররূপ। শেডের তারতম্যে বোঝানো হয়েছে যে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির জিনের কত ভাগ ডুবন্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে। পাড়ের মানুষটি নিজের জীবনের ঝুঁকি তখনই নিচ্ছেন যখন নিজের তুলনায় বেশি সংখ্যক জিন বাঁচানোর সুযোগ রয়েছে। ছবিটি আঁকা হয়েছে ‘সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজিস’ বইতে ছাপা সুধা প্রেমনাথ-এর আঁকা কার্টুনের অনুকরণে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

এই লেখাটি হাভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ছাপা প্রফেসর রাঘবেন্দ্র গদগকর-এর ‘সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজিস’ বই-এর অনুসরণে লেখা। সঙ্গে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য-র ‘বাংলার কীটপতঙ্গ’ বইটির সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। লেখার ব্যাপারে মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন পারমিতা সাহা, সৈকত চক্রবর্তী এবং সৌভিক ভট্টাচার্য।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2015/07/26/darwin-problem/

http://bigyan.org.in/2015/08/02/kin-selection-mathematics/

http://bigyan.org.in/2015/08/10/kin-selection-problems/

লেখাটি তিনটি পর্বে 'বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ২৬ জুলাই ২০১৫, ২ আগস্ট ২০১৫ ও ১০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে

স্বার্থপর মা

অনিন্দিতা ভদ্র

শীতের দুপুরে বারান্দায় বসে কমলালেবু খেতে খেতে দেখলাম পাশের বাড়ির মাসিমা কালুকে ডাকছেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে এঁটোকাঁটা ভরা বাটি নিয়ে। কালু এ পাড়ার জাঁদরেল মাদী কুকুর (ছোটবেলায় ওর নাম দেওয়ার সময় পাড়ার বাচ্চারা বুঝতে পারেনি যে ও মাদী), দুই ভাইকে নিয়ে পাড়ার মোড়টাকে আগলে রাখে সে-ই। মাস খানেক আগে কালুর চারটে নাদুসনুদুস ছানা হয়েছে, আমাদের সামনের বাড়ির বাগানে। তারা এখন শুকনো ড্রেনের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দিব্যি গড়াগড়ি খায় ঘাসে, আর মাকে পেলেই হামলে পড়ে দুধ খাওয়ার জন্য। কালু বেচারা বেশ রোগা হয়ে গেছে এই এক মাসে, অমন তাগড়া চেহারা কোথায় হারিয়ে গেছে, কয়েকটা হাড় দেখা যাচ্ছে পাঁজরের। কালুকে পাড়ার লোকজন আদর করে খেতে দিচ্ছে আজকাল; "আহা বেচারা, মা তো, দুধ খাওয়াবে কি করে বাচ্চাদের, নিজে না খেলে" কালুকে আদর করে মাছের কাঁটা আর ঝোলমাখা ভাত দিতে দিতে রমা বৌদি সেদিন ওদের কাজের মাসিকে বলছিলেন। কালু পাড়ার সব বাড়ি থেকে খেয়ে এসে বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছে, বাচ্চারাও নধর হচ্ছে দিনে দিনে।

কালুর খাওয়া দেখতে দেখতে আমি ভাবছিলাম যে আর এক-দেড় মাস পরেই ছবিটা কেমন পাল্টে যাবে – কালু ওর বাচ্চাদের সঙ্গে রেষারেষি করে খেতে চাইবে। প্রথমটায় বাচ্চারা ছোট বলে পেরে উঠবে না, কিন্তু পরের দিকে তারা মাঝেমাঝেই ঝগড়া করবে মায়ের সঙ্গে ও খাবার কেড়ে নিতে চাইবে মায়ের মুখ থেকে। তখন কালুর সৎমাসুলভ আচরণ দেখে এই বৌদিই হয়ত বিরক্ত হয়ে কালুকে তাড়িয়ে দেবেন, বলবেন "কেমন মা দেখ, নিজের বাচ্চাদের খেতে দেয় না"! প্রশ্নটা হল, আমি

কি করে এত নিশ্চিত হতে পারি যে কালু এমনটাই করবে, আর কেনই বা কালু হঠাৎ এরকম করবে ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা পরিষ্কার হয়ে যাবে পরের প্রশ্নের উত্তর থেকেই।
বছর পাঁচেক আগে, আমার ছাত্রী সৃজনী এসে আমায় জানাল যে আমাদের ল্যাবের সামনে যে কুকুরটার মাস দুয়েক আগে বাচ্চা হয়েছিল, সে নাকি খাবার নিয়ে নিজের বাচ্চাদের সঙ্গেই মারামারি করছে। অথচ আমরা জানি যে সে খুবই সচেতন মা, বাচ্চাদের আগলে রাখে, আশেপাশে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না, এমনকি, তার বাচ্চারা যখন একদম ছোট, তখন কয়েকজনের দিকে তেড়েও গেছে সে। হঠাৎ হল কি তাহলে ? সৃজনীকে বললাম একটু সময় নিয়ে ওদের পর্যবেক্ষণ করতে, আর সেই সঙ্গে আশেপাশে আরো কয়েকটা কুকুর পরিবার খুঁজে বের করতে। জানা দরকার, এই অদ্ভুত ব্যবহার শুধু এই কুকুরটাই করছে, না এটাই কুকুর-মায়েদের পক্ষে স্বাভাবিক, তাদের বাচ্চারা কিছুটা বড় হয়ে যাওয়ার পরে। সৃজনী ফিরে গেল রাস্তায়, নতুন কাজের ভার নিয়ে। আর আমি ভাবতে লাগলাম, সত্যি যদি মা কুকুর একটা সময় তার নিজের বাচ্চাদের প্রতিযোগী হয়ে ওঠে, তাহলে জীববিজ্ঞানের এক বিখ্যাত থিওরির সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারব আমরা। আর সেটা হবে একটা গবেষণামূলক কাজের মধ্যে দিয়ে, যা আজ পর্যন্ত খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে।

কি এই থিওরি?

১৯৭৪-এ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নবীন বিবর্তনবিদ, রবার্ট ট্রিভার্স (Robert Trivers) উত্থাপন করেন পেরেন্ট-অফস্প্রিং কনফ্লিক্ট থিওরির(Parent-Offspring Conflict Theory)।

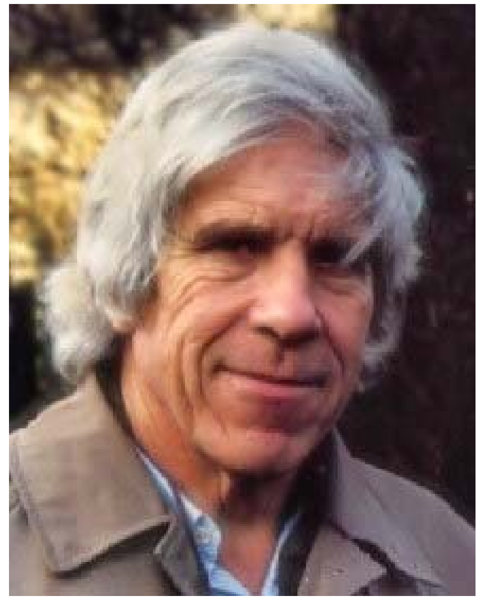

পেরেন্ট-অফস্প্রিং কনফ্লিক্ট থিওরির ভিত উইলিয়াম হ্যামিল্টনের কিন সিলেকশন থিওরি

ছবির উৎস: উইকিপিডিয়া

এর ভিত আবার দাঁড়িয়ে রয়েছে উইলিয়াম হ্যামিল্টনের (William Hamilton) কিন সিলেকশন থিওরির (Kin Selection Theory) ওপর। বেশির ভাগ প্রাণী তার মা বা বাবার জিনের ৫০% বহন করে (অঙ্কের হিসেবে)। সুতরাং এক একটি সন্তান তার মা-বাবাকে দিতে পারে ০.৫০ fitness, যা কিনা, বিবর্তনের হিসেবের খাতায় আয়। এই অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে বলি। চার্লস ডারউইনের থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন (Theory of Natural Selection) অনেকেই জানেন। এই তত্ত্বের মূল ভাব হল, জীবজগতে যে যত প্রজননক্ষম সন্তান পালন করতে পারবে, বিবর্তনের হিসেবে তার "ফিটনেস (fitness)" তত বেশি হবে, অর্থাৎ এক একটি সন্তানের জন্য তার মা-বাবার ফিটনেস এক করে তখনই বাড়বে, যখন সেই সন্তান নিজে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে।

একে বলা হয় ডারউইনীয় ফিটনেস (Darwinian fitness)। ডারউইনের সময় জিনের কথা আগে থেকে জানা ছিল না। পরবর্তীকালে যখন জেনেটিক্স (genetics) সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সমাজ অবগত হল, তখন ডারউইনের তত্ত্ব এক নতুন রূপ পেল, যার নাম নব্য ডারউইনবাদ (neo-darwinism)। সহজ ভাষায়, এ হল জেনেটিক্স ও পরিসংখ্যান (statistics) ব্যবহার করে ডারউইনের তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা। জানা গেল যে বেশির ভাগ প্রাণীর জীবন শুরু হয় একটি কোষ থেকে, যা বহন করে তার মা ও বাবার থেকে পাওয়া এক সেট করে ক্রোমোজোম (chromosome), যেগুলি বহন করে জিন। সুতরাং মানুষের শরীরে যে কোনো জিন থাকে এক জোড়া, যার একটি আসে মায়ের থেকে, অন্যটি বাবার থেকে। মানুষের ক্ষেত্রে রয়েছে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম, যার ২২টি অটোজোম (autosome) এবং শেষ জোড়া হল সেক্স ক্রোমোজোম (sex chromosome) - এই শেষ জোড়াটিই নির্ধারণ করে একটি ভ্রূণের লিঙ্গ। এবারে আসি অঙ্কে।

মনে করুন, আমি আপনাকে এক বাক্স লাল বল আর এক বাক্স নীল বল দিলাম। দুটো বাক্সেই রয়েছে ১০০-টা করে বল, এবং বলগুলোতে ১ থেকে ১০০ নম্বর দেওয়া রয়েছে। এবারে একটা থলে দিয়ে বললাম এই বাক্সদুটো থেকে ৫০টা করে বল ওই থলেতে ভরে দিতে। তাহলে থলেতে রইল ৫০% লাল বল আর ৫০% নীল বল। আবার থলের লাল বল বাক্সের ১০০টা বলের ৫০%, সুতরাং থলের সঙ্গে লাল বাক্সের সম্পর্ক ৫০%, এবং একইভাবে থলে আর নীল বাক্সের মধ্যে সম্পর্ক ৫০%। এই পর্যন্ত হিসেবটা খুব কঠিন নয় নিশ্চয়ই? এবারে যদি বলি, লাল বাক্স মা, নীল বাক্স বাবা, আর থলে হল সন্তান, যে মা ও বাবার জিনের অর্ধেক করে পেয়েছে, তাহলে? ঠিক এই হিসেবেই একটি সন্তানের সঙ্গে তার মা-বাবার জিনের সাদৃশ্য ৫০%, আর এই কারণে একটি সন্তানকে পালন করে তাকে প্রজননক্ষম করে তুলে তার মা-বাবা পেতে পারে ৫০% বা ০.৫০ ফিটনেস।

সন্তানের দিক থেকে কিন্তু হিসেবটা একটু অন্যরকম। আবার ফিরে যাই সেই বাক্স, থলে আর বলের খেলায়। মনে করুন প্রথম থলেটা ছিল কালো। এবারে আমি বললাম, লাল থলের সব বলের রঙ আর নম্বর লিখে তাদের যার যার বাক্সে ফেরত দিয়ে দিতে। এবারে একটা সাদা থলে দিয়ে বললাম বাক্সগুলো ভাল করে ঝাঁকিয়ে আবার ৫০টা করে লাল বল আর নীল বল সাদা থলেতে ভরতে। এবারে বলুন তো, আমি এই সাদা থলে থেকে যদি একটা লাল বল তুলে দেখি তার গায়ের নম্বর ১০, কালো থলের বলের তালিকায় এই ১০ নম্বর লাল বলকে পাওয়ার সম্ভাবনা কত? সম্ভাবনা তত্ত্ব(Probability theory) বলে এর উত্তর হল ২৫%। একইভাবে, যে কোনো একটি নীল বলের কালো ও সাদা থলেতে থাকার সম্ভাবনা ২৫%। এবারে যেহেতু লাল ও নীল বল একইসঙ্গে থলেতে ভরা হয়েছে, এই দুই বলের একই থলেতে থাকার সম্ভাবনা যোগ করে হয় ৫০% – অর্থাৎ কালো থলের সঙ্গে সাদা থলের মিল ৫০%। এবারে কালো থলে আর সাদা থলে যদি দিদি আর ভাই হয়? এই হিসেবে যে কোনো প্রাণীর সঙ্গে তার ভাইবোনদের জিনগত আত্মীয়তা (genetic relatedness) ৫০%, যদিও নিজের বেলায় এই সংখ্যাটা ১০০%। অতএব মা-বাবার কাছে সব সন্তান সমান হলেও, সন্তানের নিজের প্রতি পক্ষপাত থাকাটাই স্বাভাবিক। ট্রিভার্স সাহেব এই হিসেব মাথায় রেখেই দেখালেন যে parental care বা সন্তানের

প্রতি মা-বাবার যত্ন কখনই অনন্তকাল চলতে পারে না।

ধরে নেওয়া যাক এক ক্যারিবু বাছুরের কথা - জন্মের পর মায়ের দুধ খেয়েই সে বড় হয়। দুধ না পেলে সে বাঁচবে না, সুতরাং, মায়ের 'যত্ন' তার কাছে খুবই প্রয়োজনীয় বা বিবর্তনের হিসেবে মূল্যবান। সদ্যোজাত ক্যারিবুর মা তাকে যদি দুধ না খাওয়ায়, তাহলে তার নিজের ক্ষতি, কারণ তার সন্তান হারালে বিবর্তনের খাতায় তার হিসেবে ০.৫০ ফিটনেস কমে যাবে। তাছাড়া একবার জন্ম দেওয়ার পরেই মায়ের আবার জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, তার শরীরে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে কিছুটা সময় লাগে। এই সময় তার সদ্যোজাতকে যত্ন করলে মায়েরও লাভ, সন্তানেরও লাভ। তবে কিছুদিন পরেই সেই ক্যারিবু বাছুর নিজে খাবার জোগাড় করতে শেখে, এবং সেই সময় মা যদি তাকে দুধ না খাইয়ে নিজের তাকত বাড়ায়, তাহলে মায়ের লাভ, কারণ সে আর একজন সন্তানকে জন্ম দিয়ে আরও ০.৫০ ফিটনেস অর্জন করতে পারে। এখানেই শুরু হয় মতের অমিল, যার মূলে সেই হিসেবের তারতম্য। বাছুরের নিজের জন্য আয় ১.০, আর সম্ভাব্য ভাই বা বোনের জন্য আয় ০.৫০, কিন্তু মায়ের কাছে তো দুজনেই সমান। তাই মা দুধ খাওয়ানো বন্ধ করতে চাইলেও, বাছুর কিন্তু তা চাইবে না, সে চাইবে আরও কিছুদিন মা তাকে যত্ন করুক, অর্থাৎ দুধ খাওয়াক। আরো কিছুদিন বাদে, বাছুর আর একটু বড় হলে, সে নিজেও আর মায়ের কাছে এই যত্ন দাবি করবে না, কারণ মা যদি তাকে দুধ খাইয়ে বেশি কাহিল হয়ে পড়ে, তাহলে হয়ত আর সন্তানের জন্ম দিতেই পারবে না, যার ফলে ০.৫০ ক্ষতি হবে দুই পক্ষেরই। এই যে টানাপোড়েন, এর মেয়াদ খুব কম হলেও, মা ও সন্তানের সম্পর্কে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ট্রিভার্সের তত্ত্ব মূলত দুধ খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে মা ও সন্তানের দ্বন্দ্ব আলোচনা করলেও, এর পরিধি বহুব্যাপী। জীবনের বিভিন্ন স্তরে এই দ্বন্দ্ব দেখা যায়, বিভিন্নভাবে এর প্রকাশ ঘটতে পারে, এমনকি মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সামাজিক প্রসঙ্গেও এই একই যুক্তি লাগিয়ে মানুষের ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে বেশিরভাগ গবেষণাই হয়েছে তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে, মডেলিং (modeling) ব্যবহার করে। সুতরাং কুকুর-মায়ের তার বাচ্চাদের সঙ্গে সৎ-মা সুলভ আচরণের কথা শুনে আমার মাথায় এল যে এটা হয়ত পেরেন্ট-অফস্প্রিং কনফ্লিক্ট থিওরিরই আভাস হতে পারে।

মা কুকুর বাচ্চাদের যদি দুধ না খাওয়ায়, তাহলে তার নিজের ক্ষতি, কারণ সন্তান হারালে বিবর্তনের খাতায় তার হিসেবে ০.৫০ ফিটনেস কমে যাবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সৃজনী চার-পাঁচটা কুকুর পরিবারের সন্ধান পেল, যেখানে কুকুরছানারা প্রায় এক বয়সের, আর একাধিক মা-কুকুর একইভাবে তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে খাবার নিয়ে মারামারি করছে। সব ক্ষেত্রেই বাচ্চাদের বয়স দুমাসের একটু বেশি বা কম। ঠিক হলো, আমরা শুরু করবো একটা আনকোরা এক্সপেরিমেন্ট – যার নাম দেওয়া হলো POC (parent-offspring conflict) পরীক্ষা। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, মা-কুকুর আর তার

বাচ্চাদের খাবার দিয়ে প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেওয়া, আর দেখা যে ওদের মধ্যে খাবারের জন্য প্রতিযোগিতা ঠিক কি ধরণের হয়। খাবার হিসাবে বেছে নেওয়া হল পাঁউরুটি বা বিস্কুট – ভারতের নেড়ী কুকুরদের যা নিত্য নৈমিত্তিক আহার ! ঠিক হল, খাবার দেওয়া হবে কুকুরদের, প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে, দিনে দুবার, সকালে আর দুপুরে। একটি পরিবারে মা আর বাচ্চা মিলিয়ে যতজন সদস্য, ঠিক তত টুকরো খাবার পাবে তারা, কিন্তু একসঙ্গে নয়, একটা টুকরো শেষ হলে পরেরটা ছুঁড়ে দেওয়া হবে তাদের দিকে। এমনভাবে দেওয়া হবে যাতে সবাই সমান সুযোগ পায় টুকরোটা পাবার। সবগুলো টুকরো খাওয়া হয়ে গেলে থামানো হবে পরীক্ষা। এভাবে কুকুরছানাদের ৮ থেকে ১৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে চারবার করে করা হবে পরীক্ষা, আর পুরো কাজটাই রেকর্ড করে রাখা হবে ভিডিওতে। পুরো কাজ শেষ হলে তবেই সেই ভিডিও দেখে তথ্য (data) সংগ্রহ করা হবে, যাতে কোনোভাবেই পক্ষপাত (bias) না ঢুকে পড়ে আমাদের কাজে – এ হলো পশুপাখি নিয়ে কাজ করার পদ্ধতির নানান সাবধানতার মধ্যে একটি। পক্ষপাত বা Bias বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি তা একটু খোলসা করে বলি। ধরুন যদি পরীক্ষা চলাকালীন ভিডিও দেখে স্পষ্ট হয় যে কোনো এক মা একটু বেশি কাড়াকাড়ি করে খাবার খেয়ে নিচ্ছে, বা কোনো একটি কুকুরছানা একটু বেশি পিছিয়ে পড়ছে, তবে অবচেতনে থাকা "মানবিকতা" অনেক সময় কাজে বাদ সাধতে পারে, খাবার দেওয়ার সময় ঢুকে পড়তে পারে পক্ষপাত।

গোটা দুয়েক পাইলট এক্সপেরিমেন্ট চালালো সৃজনী। পাইলট যেমন বিমানকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, তেমনই পাইলট এক্সপেরিমেন্ট যে কোনো রিসার্চ-কে সঠিক দিকে চালিত করে। পাইলট এক্সপেরিমেন্ট করা হয় কোনো বড় কাজে হাত দেওয়ার আগে, যাতে পরিকল্পনায় কোনো ত্রুটি থাকলে তা শুধরে নেওয়া যেতে পারে। সেই সময় আমাদের ল্যাবে নতুন আসা মানবীকেও লাগানো হলো এই কাজে। কুকুরছানার কোনো অভাব নেই আমাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের কলকাতা (IISER) ক্যাম্পাসে, অভাব শুধু সময়ের। এই কুকুরছানারা বড় হয়ে গেলে আবার এক বছর অপেক্ষা করতে হবে এই কাজটা শেষ করার জন্য। আর হলও তাই – দুজনে মিলে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল টানা কাজ করেও পরীক্ষামূলক তথ্য পাওয়া গেল সাতজন মা আর তাদের বাচ্চাদের। কাজ যথেষ্ট ভালো হলেও, আরো এক বছর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় রইলো না, কারণ সাতজন মায়ের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে স্ট্যাটিসটিকাল অ্যানালিসিস (statistical analysis) চালিয়ে কিছু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হলেও, তা বাঞ্ছিত নয়। পরের বছর আবার চললো কুকুর পরিবারদের নিয়ে গবেষণা, আর এবারে পাওয়া গেলো যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য। খুব খুশি হয়ে আমরা এবারে ওই পনেরোটি কুকুর পরিবারের ভিডিও থেকে তথ্য নিয়ে নামলাম সেগুলো কাটাছেঁড়া করার কাজে – এই কাজে আমাদের অস্ত্র পরিসংখ্যান, আর অবশ্যই মগজাস্ত্র।

যা জানা গেলো, তাতে আমরা আহ্লাদে আটখানা। প্রথমদিকে মায়েরা খাবার দেখেও মুখ ফিরিয়ে থাকে, অথবা খাবার মুখে নিয়ে বাচ্চাদের দেয় ও বসে বসে তাদের খাওয়া দেখে – যেন মাতৃত্বের আদর্শ নিদর্শন। কিন্তু যত বাচ্চারা বড় হতে থাকে, তত মা-সুলভ এই ব্যবহারের অভাব দেখা যেতে থাকে। তখন মাঝেমাঝেই আগেভাগে খাবারে ভাগ বসাতে ছুটে যায় মা, অনেক সময় বাচ্চাদের মুখ থেকে কেড়ে নেয় খাবার, খেঁকিয়ে ওঠে ছুটে আসা বাচ্চাদের দেখে। ১২-১৩ সপ্তাহের কুকুরছানারা প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না এই পালটে যেতে

থাকা মারমুখী মায়ের সঙ্গে। মায়ের এই দুই ধরনের ব্যবহারকে আমরা নাম দিলাম "সহযোগিতা" (cooperation) আর "সংঘাত" (conflict)। দেখা গেল যে পনেরোজন মায়ের মধ্যে বিশেষ কোনো হেরফের নেই বাচ্চাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাকে কেন্দ্র করে। এমনকি litter size, অর্থাৎ কার ক-জন বাচ্চা তার ওপরেও নির্ভর করে না মায়ের খাবার কেড়ে নেওয়ার প্রবণতা। এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে একজন বাচ্চাকে যে দুধ খাওয়ায়, তার চেয়ে চারজন বাচ্চাকে যে দুধ খাওয়ায় তার খিদে বেশি, আর সেই কারণে তার সংঘাতের প্রবণতাও বেশি । বাচ্চাদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা litter size এর সঙ্গে বাড়লেও, মায়ের "সংঘাত" কিন্তু এসবের ধার ধারে না। আমাদের তথ্য দেখে বোঝা গেল যে যতজন ক্ষুধার্ত বাচ্চাই তাদের মুখ চেয়ে থাকুক না কেন, মায়েরা খাবারে ভাগ বসায় 'ইচ্ছেমত'। শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে উত্তরোত্তর রোগা হয়ে যাওয়া কুকুর-মায়েরা এই পরীক্ষার সময়টুকুর মধ্যে দিব্যি স্বাস্থ্য ফিরে পায়। এমন মাকে স্বার্থপর ছাড়া আর কি বা বলা যায়?

সুতরাং আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রমাণ করলাম যে, কুকুর-মা আর তার সন্তানদের মধ্যে রয়েছে এক বিবর্তনীয় দ্বন্দ্ব, এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে একটা বয়সের পরে মা যে শুধু তার বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতেই নারাজ হয় তা নয়, তাদের মুখের খাবার কেড়ে নিতেও সে পিছপা হয় না। এর ফলে মা কিছুদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য ফিরে পায়, তৈরী হয় পুনরায় মা হওয়ার জন্য। আপাতদৃষ্টিতে এতে বাচ্চাদের ক্ষতি হলেও, বিবর্তনের হিসেবের খাতায় এতে উভয় পক্ষের লাভই হয়। সুতরাং আমাদের কালু আপাতত যতই ভালো মা হোক না কেন, অচিরেই তার সৎ-মা সুলভ আচরণ যে শুরু হবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। মজাটা হল যে, কুকুর-মায়েরা যখন তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে খাবার নিয়ে মারামারি আরম্ভ করে, তখন মানুষ খুবই বিরক্ত হয়, আর তার ফলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদর করে খেতে দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এর ফলে মায়েদের হাতে কয়েক সপ্তাহ সময় থাকে, যখন তারা আর বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায় না, উলটে মানুষ যখন বাচ্চাদের খেতে দেয়, সেই খাবারে ভাগ বসিয়ে নিজেদের স্বাস্থ্য ফেরাতে চায়। কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে বিবর্তিত হতে হতে এই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতে শিখে গেছে কুকুর-মায়েরা।

লেখিকা পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

লেখিকা আই. আই. এস. ই. আর. কলকাতায় বায়োলজি বিভাগে অধ্যাপিকা। পশুপাখির স্বভাবচরিত্র ও বিবর্তন নিয়ে তাঁর গবেষণা। কুকুরের উপর তাঁর বিশেষ উৎসাহ, একেই মডেল সিস্টেম হিসেবে স্টাডি করেন। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, তিনি বোঝার চেষ্টা করছেন তারা মানুষের সাথে সহবাস করতে শিখলো কি করে। গবেষণার বাইরে তিনি পড়াতে খুব ভালোবাসেন। এছাড়াও INYAS বলে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন ।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2016/10/18/conflict/

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ ১৮ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল

মায়েরা যেমন হয় - কুমোরে পোকার সন্তান পালন

অনিন্দিতা ভদ্র

কালচে রঙের কিছুটা বড় মাপের তন্বী বোলতা, ভীষণ ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে ঘরের ভেতরে। তার লক্ষ্য হল আমাদের loft-এ রাখা একটা খালি বাক্স। একটু ভালো করে দেখলেই বোলতা রমণীর মুখে ধরে থাকা মাটির দানা দেখা যাবে। বোলতাটি কুমোরে পোকা বা potter wasp। কিছু কুমোরে পোকা মাটি দিয়ে ভরে দেয় প্লাগ পয়েন্টের গর্ত, আবার কেউ কেউ দেওয়ালের খাঁজে, টেবিলের তলায়, ফেলে রাখা কাগজপত্র বা বাক্স ইত্যাদির গায়ে তৈরী করে ছোট্ট সুন্দর বাসা। আমদের loft-এ একটা পুরনো ব্যাগ অনেকদিন রাখা ছিল একসময়, কারণ তার বিভিন্ন খাঁজে ছিল ডজন খানেক কুমোরে পোকার বাসা। এই বাক্সটার দেওয়ালে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে বাসার আধখানা, একটা ক্ষুদে বাটির মতো।

জীবজগতে বাসা তৈরী করা হয় প্রধানত সন্তান পালনের জন্য। বাসা তৈরীতে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে পাখিরা। ডিম পাড়ার সময় হলে পাখি দম্পতিরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে আগামী প্রজন্মকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় গড়ে দেওয়ার চেষ্টায়। বাসার কথা ভাবলে আর যাদের কথা মনে পড়ে, তারা হল মৌমাছি, পিঁপড়ে আর উইপোকারা। এদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও বোলতারা সচরাচর ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। অথচ তারা কিন্তু মৌমাছি বা পিঁপড়েদের থেকে খুব পিছিয়ে নেই। যে সব বোলতারা সামাজিক তাদের কথা ছেড়ে দিলেও এই কুমোরে পোকারা মাতৃত্বের এক সুন্দর নিদর্শন।

মা বোলতাকে কেউ শিখিয়ে দেয় না কি করে বাসা তৈরী করতে হয়। সবকিছুই programmed হয়ে থাকে জিনে। প্রকৃতিতে এদের বিবর্তন এমন ভাবেই ঘটেছে যে মা-বোলতা ‘জানে’ তার কি

কাজ। বাসা বানাবার উপযুক্ত মাটি খুঁজে এনে তাকে লালা দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে একটু একটু করে গড়ে তুলতে হবে ঘটের মতো ছোট্ট বাসা। বাসা যখন প্রায় তৈরী, তখন খুঁজতে হবে নধর কোনো গুটিপোকা (caterpillar)। এই পোকাকে সে হুল ফুটিয়ে অসাড় করে ভরে দেবে বাসার মধ্যে, তার গায়ে নিজের ডিম পেড়ে আরও মাটি এনে বাসার মুখ বন্ধ করে দেবে। অসাড় গুটিপোকা বেঁচে থাকবে কিন্তু পালাতে পারবে না। কোনো কোনো কুমোরে পোকা একাধিক গুটিপোকা এনে বাসাকে বোঝাই করে, কেউ একই বাসায় অনেক ডিম পাড়ে, কেউ আবার আলাদা আলাদা বাসা তৈরী করে প্রতিটা ডিমের জন্য। বাসার মুখ বন্ধ করে দিয়ে উড়ে যায় বোলতা মা।

তারপর? সন্তানদের জন্য রসদ জোগাড় করে, তাদের সুরক্ষিত করে কাহিল হয়ে পড়া মা মারা যায়। ডিম ফুটে বের হয় ছোট্ট লার্ভা-ছানারা। প্রজাপতিদের মতো এদেরও ডিম ফুটে বের হয় গুটিপোকা, যাদের কাজ শুধু খাওয়া আর বেড়ে ওঠা। বাড়তে বাড়তে যখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়, তখন এক সময় নিজেরাই বুনে নেয় গুটি, তার ভেতরে নানারকম শারীরিক পরিবর্তনের (metamorphosis) পর বেরিয়ে আসে প্রাপ্তবয়স্ক পোকারা। বোলতা-মা'র জুগিয়ে যাওয়া রসদ খেয়ে বেড়ে ওঠে লার্ভারা, সময় মত তৈরী করে cocoon (গুটি)। শেষে মাটির দুর্গ ভেঙে বেরিয়ে আসে বোলতা স্ত্রী-পুরুষেরা। বেরিয়েই তারা খুঁজে নেয় একে অন্যকে, গন্ধ দিয়ে, মিলিত হয়। এদের জীবনযাত্রা খুবই হিসেবী, অপচয় খুব কম – পুরুষদের প্রয়োজন ফুরোলে তাদের জীবনও শেষ হয়ে যায়। দিনের আলোয়, খোলা হাওয়ায় উড়ে বেড়াবার সময় তাদের খুবই সীমিত। সদ্য আলো দেখা মা-বোলতাদের সামনে তখন অনেক কাজ – নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়ে যেতে হবে তাকে, যেমন তার জন্য দিয়েছিল তার মা।

লেখিকা পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

লেখিকা আই. আই. এস. ই. আর. কলকাতায় বায়োলজি বিভাগে অধ্যাপিকা। পশুপাখির স্বভাবচরিত্র ও বিবর্তন নিয়ে তাঁর গবেষণা। কুকুরের উপর তাঁর বিশেষ উৎসাহ, একেই মডেল সিস্টেম হিসেবে স্টাডি করেন। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, তিনি বোঝার চেষ্টা করছেন তারা মানুষের সাথে সহবাস করতে শিখলো কি করে। গবেষণার বাইরে তিনি পড়াতে খুব ভালোবাসেন। এছাড়াও INYAS বলে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন ।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2014/09/05/potter-wasp/

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল

প্রচ্ছদের ছবি: নাতাশা মাহত্রে।

পেঁয়াজি

পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী

পেঁয়াজ বড়ই পাজি। রান্না করতে পেঁয়াজ কেটেছ কি মরেছ। চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল নেমে আসবে। কাঁদিয়েই ছাড়বে তোমায়। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছ কেন এমনটা হয় ?

নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে পেঁয়াজের মধ্যে। তুমি যখন ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটছ, তখন যদি একটা খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (microscope) মধ্যে দিয়ে দেখতে, তাহলে বুঝতে পারতে পেঁয়াজের কোষগুলো ছুরির কোপে কেটে যাচ্ছে । আর এই কোষগুলোর মধ্যেই থাকে একটা উৎসেচক (enzyme), যার নাম অ্যালিনেজ (alliinase) এবং সাল্ফক্সাইড (sulfoxide) গোত্রের রাসায়নিক পদার্থ আইসোঅ্যালিন (isoalliin)। এরা রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তৈরি করে এক ধরনের সালফেনিক অ্যাসিড যার রাসায়নিক নাম ১-প্রপিনাইল সালফেনিক অ্যাসিড (1-propenyl sulfenic acid)। এই পর্যন্ত সব ভালো। কিন্তু এরপর গল্পের মধ্যে প্রবেশ হলো এক ভিলেনের।

সেই ভিলেন আর এক উৎসেচক , ল্যাক্রাইমেটরি ফ্যাক্টর সিন্থেজ (lachrymatory factor synthase)। ইনিও কোষের মধ্যেই থাকেন ঘাপটি মেরে। ইনি সালফেনিক অ্যাসিড থেকে যত নষ্টের গোড়া প্রপান্থায়াল এস-অক্সাইড (propanthial S-oxide) তৈরি করেন। আর এই গ্যাসীয় পদার্থটি খুবই মারাত্মক। আমাদের চোখের মধ্যে যে স্নায়ু আছে তাকে বিরক্ত করে এই গ্যাস। চোখ জ্বালা করতে শুরু করে। তখন আমাদের বেচারি চোখ এই গ্যাসীয় অণুগুলোকে বিদায় করতে জল বার করে, অনেকটা কলের জল দিয়ে বাসন মাজার মত পরিষ্কার করে দেয় আমাদের চোখ। আর তুমি ফিচ ফিচ করে কাঁদতে থাকো আর চোখ-নাক দিয়ে জল বেরোতে থাকে।

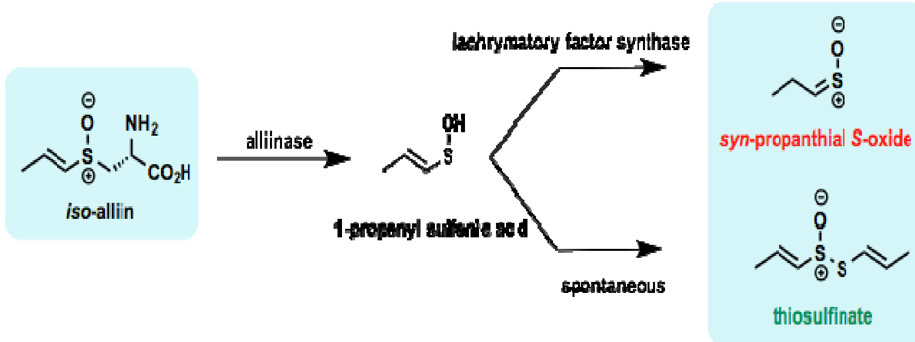

তোমাদের মধ্যে যারা কলেজে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করছ, তারা হয়ত রাসায়নিক নামকরণ থেকে অণুর চেহারাও আন্দাজ করতে পারবে। তবে না পারলেও ক্ষতি নেই। পাশে রাসায়নিক গঠন সহ বিক্রিয়াগুলোর একটা রূপরেখা দেওয়া হলো। লাল রঙের রাসায়নিক পদার্থটি হলো সেই ভিলেন ল্যাক্রাইমেটরি ফ্যাক্টর সিন্থেজের রাসায়নিক পরমাস্ত্র। এই ভিলেন না থাকলে অবশ্য সালফেনিক অ্যাসিড থেকে থায়োসাল্ফিনেট (thiosulfinate) গোত্রের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় দুটো অণু স্বতস্ফূর্ত ভাবে জুড়ে গিয়ে, যা কিনা আর যাই করুক না কেন চোখে জ্বালা ধরায় না।

প্রসঙ্গত বলে রাখি যে রসুনেও এরকম রাসায়নিক পদার্থ থাকে। সেখানেও এমন বিক্রিয়া হয় ঠিকই, কিন্তু সেখানে রাসায়নিক পদার্থটি একটু আলাদা, তাই ওই ভিলেন কিস্যু করতে পারে না। সেখানে আইসোঅ্যালিনের বদলে থাকে অ্যালিন আর তাই অ্যালিনেজ তৈরি করে ২-প্রপিনাইল সালফেনিক অ্যাসিড, যা খুব দ্রুত একইরকম আরেকটি অণুর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে অ্যালিসিন (allicin) তৈরি করে। নিচে তার রাসায়নিক গঠন দেওয়া হলো। খেয়াল করে দেখো, এটাও কিন্তু থায়োসাল্ফিনেট (thiosulfinate) গোত্রের।

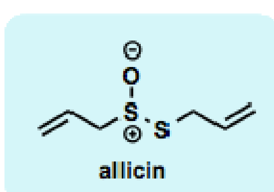

এবার ভেবে দেখো যে এই ভিলেনকে যদি তুমি জব্দ করতে পারো কোনোভাবে, তাহলে কিন্তু পেঁয়াজ কাটতে আর কষ্ট হবে না অথচ রান্নাও দারুন হবে। নিউজিল্যান্ডের কিছু বিজ্ঞানী সেরকমই একটা কাণ্ড করেছিলেন এমন পেঁয়াজ বানিয়ে যা কাটলে চোখ দিয়ে জল গড়ায় না। তবে সেই পেঁয়াজ এখনো বাজারে পাওয়া যায় না।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

পদক্ষেপ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2014/12/06/peyaji/

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ ৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল

প্রচ্ছদের ছবিটি কপিরাইট ফ্রী

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- লেখাটিকে এক হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। তবে লেখার বিষয়বস্তুর উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এর থেকে বড় লেখা লিখতে হলে সম্পাদকদের সাথে লেখা জমা দেওয়ার আগে আলোচনা করে নিন (bigyan.org.in-at-gmail-dot-com)।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে। ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।